سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ خَمْسٌ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً وَّعَشْرُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا
اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ① اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ
قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ② ۚۖ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ③ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ
دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ④ ۚ كَمَآ
اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۪ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
لَكٰرِهُوْنَ ⑤ ۙ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ
اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ⑥ ؕ وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى
الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ
تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ
الْكٰفِرِيْنَ ⑦ ۙ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ⑧

সূরা আল-আনফাল

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত, ৭৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

(১) আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনীমতের হুকুম। বলে দিন, গনীমতের মাল হল আল্লাহ্র এবং রসূলের। অতএব, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য কর – যদি ঈমানদার হয়ে থাক। (২) যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্র নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে। (৩) সে সমস্ত লোক যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে– (৪) তারাই হল সত্যিকার ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুযী। (৫) যেমন করে তোমাকে তোমার পরওয়ারদেগার ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না। (৬) তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে,তা প্রকাশিত হবার পর; তারা যেন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখতে দেখতে। (৭) আর যখন আল্লাহ্ দু' টি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোন রকম কন্টক নেই, তাই তোমাদের ভাগে আসুক; অথচ আল্লাহ্ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফেরদের মূল কর্তন করে দিতে, (৮) যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাপীরা অসন্তুষ্ট হয়।

সূরা আল-আনফাল

সূরার বিষয়বস্তু ঃ

সূরা আন্ফাল এখন যা আরম্ভ হচ্ছে, এটি মদীনায় অবতীর্ণ সূরা। এর পূর্ববর্তী সূরা আ'রাফে মুশরেকীন (অংশীবাদী) এবং আহলে-কিতাবের মূর্খতা, বিদ্বেষ, কুফরী ও ফেৎনা-ফাসাদ সংক্রান্ত আলোচনা এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়ের বর্ণনা ছিল।

বর্তমান সূরাটিতে আলোচিত অধিকাংশ বিষয়ই বদরের যুদ্ধকালে সেই কাফের, মুশরিক ও আহলে-কিতাবের অশুভ পরিণতি, তাদের পরাজয় ও অকৃতকার্যতা এবং তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদের কৃতকার্যতা সম্পর্কিত, যা মুসলমানদের জন্য ছিল একান্ত কৃপা এবং কাফেরদের জন্য ছিল আযাব ও প্রতিশোধস্বরূপ।

আর যেহেতু এই কৃপা ও দানের সবচাইতে বড় কারণ ছিল মুসলমানদের নিঃস্বার্থতা, পারস্পরিক ঐক্য, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্যের ফল, সেহেতু সূরার প্রারম্ভেই তাক্ওয়া,পরহেযগারী এবং আল্লাহ্র আনুগত্য, যিকির ও ভরসা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। আয়াতের বিস্তারিত তফসীরের পূর্বে সে-ঘটনাটি জানা থাকলে এর তফসীর বুঝতে সহজ হবে বলে আশা করি।

ঘটনাটি হল এই যে, কুফর ও ইসলামের প্রথম সংঘর্ষ বদর যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়ে গেল এবং কিছু গনীমতের মাল-সামান হাতে এল, তখন সেগুলোর বিলি-বন্টন নিয়ে সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যে এমন এক ঘটনা ঘটে যা নিঃস্বার্থতা, এখলাস ও ঐক্যের সেই সুউচ্চমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না, যার ভিত্তিতে সাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ)-এর গোটা জীবন ঢেলে সাজানো ছিল। সেজন্য সর্বাগ্রে এ আয়াতে তার সমাধান দেয়া হয়, যাতে করে এই পূতঃপবিত্র এবং নিষ্কলুষ সম্প্রদায়ের অন্তরে বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থতা এবং ঐক্য ও আত্মত্যাগের প্রেরণা ছাড়া অন্য কোন বিষয় থাকতে না পারে।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হযরত ওবাদা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে-মাজা, মুসতাদরাকে-হাকেম প্রভৃতি গ্রন্থে এভাবে উদ্ধৃত রয়েছে যে, হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)-এর নিকট কোন এক ব্যক্তি আয়াতে উল্লেখিত 'আনফাল' শব্দের মর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "এ আয়াতটি তো আমাদের অর্থাৎ, বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। সে ঘটনাটি ছিল এই যে, গনীমতের মালামাল বিলি-বন্টন ব্যাপারে আমাদের মাঝে সামান্য মতবিরোধ হয়ে গিয়েছিল যাতে আমাদের পবিত্র চরিত্রে একটা অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আল্লাহ্ এ আয়াতের মাধ্যমে গনীমতের সমস্ত মালামাল আমাদের হাত থেকে নিয়ে রসূলে করীম (সাঃ)-এর দায়িত্বে অর্পণ করেন। আর রসূলে করীম (সাঃ) বদরে অংশগ্রহণকারী সবার মধ্যে সমানভাবে সেগুলো বন্টন করে দেন।"

ব্যাপার ঘটেছিল এই যে, বদরের যুদ্ধে আমরা সবাই রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে বেরিয়ে যাই এবং উভয়দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধের পর আল্লাহ্ তাআলা যখন শত্রুদের পরাজিত করে দেন, তখন আমাদের সেনাবাহিনী তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু লোক শত্রুদের

পশ্চাদ্ধাবন করেন, যাতে তারা পুনরায় ফিরে আসতে না পারে। কিছু লোক কাফেরদের পরিত্যক্ত গনীমতের মালামাল সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। আর কিছু লোক রসূলে করীম (সাঃ)–এর পাশে এসে সমবেত হন, যাতে গোপনে লুকিয়ে থাকা কোন শত্রু মহানবী (সাঃ)–এর উপর আক্রমণ করতে না পারে। যুদ্ধ শেষে সবাই যখন নিজেদের অবস্থানে এসে উপস্থিত হন, তখন যাঁরা গনীমতের মালামাল সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁরা বলতে লাগলেন যে, এ সমস্ত মালামাল যেহেতু আমরা সংগ্রহ করেছি, কাজেই এতে আমাদের ছাড়া অপর কারও ভাগ নেই। আর যারা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়েছিলেন তাঁরা বললেন, এতে তোমরা আমাদের চাইতে বেশী অধিকারী নও। কারণ, আমরাই তো শত্রুকে হটিয়ে দিয়ে তোমাদের জন্য সুযোগ করে দিয়েছি যাতে তোমরা নিশ্চিন্তে গনীমতের মালামালগুলো সংগ্রহ করে আনতে পার। পক্ষান্তরে যারা মহানবী (সাঃ)–এর হেফাযতকল্পে তাঁর পাশে সমবেত ছিলেন, তাঁরা বললেন, আমরাও ইচ্ছা করলে গনীমতের এই মাল সংগ্রহে তোমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারতাম, কিন্তু আমরা জেহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হুযূরে আকরাম (সাঃ)–এর হেফাযতে নিয়োজিত ছিলাম। অতএব আমরাও এর অধিকারী।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)–এর এসব কথাবার্তা হুযূর (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছলে পর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এসব মালামাল আল্লাহ্ তাআলার; একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত এর অন্য কোন মালিক বা অধিকারী নেই; শুধু তাঁকে ছাড়া যাঁকে রসূলে করীম (সাঃ) দান করেন। সুতরাং মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ অনুযায়ী এসব মালামাল জেহাদে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সমানভাবে বন্টন করে দেন।—(ইবনে–কাসীর) অতঃপর সবাই আল্লাহ্ ও রসূলের এই সিদ্ধান্তের উপর রাযী হয়ে যান এবং তাঁদের মহান মর্যাদার পরিপন্থী পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেজন্য সবাই লজ্জিত হন।

انفال শব্দটি نفل এর বহুবচন। এর অর্থ অনুগ্রহ, দান ও উপঢৌকন। নফল নামায, রোযা, সদ্কা প্রভৃতিকে এ কারণেই 'নফল' বলা হয় যে, এগুলো কারো উপর অপরিহার্য কর্তব্য ও ওয়াজিব নয়। যারা তা করে, নিজের খুশীতেই করে থাকে। কোরআন ও সুন্নাহ্র পরিভাষায় 'নফল ও আন্ফাল' গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ মালামালকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা যুদ্ধকালে কাফেরদের থেকে লাভ করা হয়। তবে কোরআন মজীদে এতদর্থে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে – (১) আন্ফাল (২) গনীমত এবং (৩) ফায়। انفال শব্দটি তো এ আয়াতেই রয়েছে। আর غنيمة (গনীমত) শব্দ এবং তার বিশ্লেষণ এ সূরার একচল্লিশতম আয়াতে আসবে। আর فئ এবং তার ব্যাখ্যা সূরা হাশরের আয়াত .. وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এ তিনটি শব্দের অর্থ যৎসামান্য পার্থক্যসহ বিভিন্ন রকম। সামান্য ও সাধারণ পার্থক্যের কারণে অনেক সময় একটি শব্দকে অন্যটির জায়গায় শুধু 'গনীমতের মাল' অর্থেও ব্যবহার করা হয়। انفال(গণীমত) সাধারণতঃ সে মালকে বলা হয়, যা যুদ্ধ–জেহাদের মাধ্যমে বিরোধী দলের কাছ থেকে হাসিল করা হয়। আর فئ (ফায়) বলা হয় সে মালকে যা কোন রকম যুদ্ধ–বিগ্রহ ছাড়াই কাফেরদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তা সেগুলো ফেলে কাফেররা পালিয়েই যাক, অথবা স্বেচ্ছায় দিয়ে দিতে রাজী হোক। আর نفل ও انفال (নফল ও আন্ফাল) শব্দটি অধিকাংশ সময় এন্আম বা পুরস্কার অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা জেহাদের নায়ক কোন বিশেষ মুজাহিদকে তার কৃতিত্বের বিনিময় হিসাবে গনীমতের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়ে থাকেন। তফসীরে ইবনে–জরীর গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে–আব্বাস (রাঃ) থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করা হয়েছে।—(ইবনে–কাসীর) আবার কখনও 'নফল' ও 'আন্ফাল' শব্দ দ্বারা সাধারণ গনীমতের মালকেও বোঝানো হয়। এ আয়াতের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ তফসীরকার এই সাধারণ অর্থই গ্রহণ করেছেন। সহীহ্ বোখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে–আব্বাস (রাঃ) থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ শব্দটি সাধারণ–অসাধারণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে কোন মতবিরোধ নেই। বস্তুতঃ এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা হল সেটাই; যা ইমাম আবু ওবাইদ (রহঃ) করেছেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থ 'কিতাবুল আম্ওয়াল'–এ উল্লেখ করেছেন যে, মূল অভিধান অনুযায়ী 'নফল' বলা হয় দান ও পুরস্কারকে। আর এই উম্মতের প্রতি এটা এক বিশেষ দান যে, জেহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে যেসব মাল–সামান কাফেরদের কাছ থেকে লাভ করা হয়, সেগুলো মুসলমানদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। বিগত উম্মতের মধ্যে এই প্রচলন ছিল না।

উল্লেখিত আয়াতে আন্ফাল–এর বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহ্র এবং রসূলের। তার অর্থ এই যে, এগুলোর প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এবং রসূলে করীম (সাঃ) হচ্ছেন সেগুলোর ব্যবস্থাপক। তিনি আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ মোতাবেক স্বীয় কল্যাণ বিবেচনায় সেগুলো বিলি–বন্টন করবেন।

সেজন্যই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে–আব্বাস, ইকরিমাহ্ (রাঃ) এবং মুজাহিদ ও সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখসহ তফসীরবিদগণের এক বিরাট দল মত প্রকাশ করেছেন যে, এই হুকুমটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক আমলের, যখন গনীমতের মাল–সামান বিলি–বন্টনের ব্যাপারে কোন আইন অবতীর্ণ হয়নি। আলোচ্য সূরার পঞ্চম রুকূতে এ বিষয়টিই আলোচিত হবে। এ আয়াতে গনীমতের যাবতীয় মালামালের বিষয়টি মহানবী (সাঃ)–এর কল্যাণ–বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তার ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু পরবর্তীতে যে বিস্তারিত বিধি–বিধান এসেছে, তাতে বলে দেয়া হয়েছে যে, গনীমতের সম্পূর্ণ মালামালকে পাঁচ ভাগ করে তার এক ভাগ বায়তুলমালে সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজনের লক্ষ্যে সংরক্ষণ করতে হবে এবং বাকী চার ভাগ বিশেষ নিয়ম–নীতির ভিত্তিতে জেহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। সে সমস্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ সূরা আন্ফালের আলোচ্য প্রথম আয়াতটিকে রহিত করে দিয়েছে। আবার কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, এখানে কোন 'নাসেখ–মনসুখ' অর্থাৎ, রহিত কিংবা রহিতকারী নেই, বরং সংক্ষেপন ও বিশ্লেষণের পার্থক্য মাত্র। সূরা আন্ফালের প্রথম আয়াতে যা সংক্ষেপে বলা হয়েছে, একত্রিশতম আয়াতে তারই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অবশ্য 'ফায়'–এর মালামাল—যার বিধান সূরা হাশরে বিবৃত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে রসূলে করীম (সাঃ)–এর অধিকারভুক্ত। তিনি নিজের ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। সে কারণেই সেখানে তার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

"আমার রসূল যা কিছু তোমাদের দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে বারণ করেন, তা থেকে বিরত থাক।"

এই বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, গনীমতের মাল হলো সেসমস্ত মালামাল যা যুদ্ধ–জেহাদের মাধ্যমে হস্তগত করা হয়। আর 'ফায়' হল সে সমস্ত মালামাল যা কোন রকম লড়াই এবং জেহাদ ছাড়াই হাতে আসে। আর انفال (আন্ফাল) শব্দটি উভয় মালামালের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেই বিশেষ পুরস্কার বা উপঢৌকনের

অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা জেহাদের নেতা বা পরিচালক দান করেন।

এ প্রসঙ্গে সাথীদেরকে পুরস্কার দেয়ার চারটি রীতি মহানবী (সাঃ)–এর যুগ থেকে প্রচলিত রয়েছে। (এক) একথা ঘোষণা করে দেয়া যে, যে লোক কোন বিরোধী শত্রুকে হত্যা করতে পারবে— যে সামগ্রী তার সাথে থাকবে সেগুলো তারই হয়ে যাবে, যে হত্যা করেছে। এসব সামগ্রী গনীমতের সাধারণ মালামালের সাথে জমা হবে না। (দুই) বড় কোন সৈন্যদল থেকে কোন দলকে পৃথক করে কোন বিশেষ দিকে জেহাদ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়া এবং এমন নির্দেশ দিয়ে দেয়া যে, এদিক থেকে যেসব গনীমতের মালামাল সংগৃহীত হবে সেগুলো উল্লেখিত বিশেষ দলের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে যারা সে অভিযানে অংশগ্রহণ করবে। তবে এতে শুধু এটুকু করতে হবে যে, সমস্ত মালামাল থেকে এক পঞ্চমাংশ সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজনে বায়তুলমালে জমা করতে হবে। (তিন) বায়তুলমালে গনীমতের যে এক পঞ্চমাংশ জমা করা হয়,তা থেকে কোন বিশেষ গাযী (জয়ী)–কে তার কোন বিশেষ কৃতিত্বের প্রতিদান হিসাবে আমীরের কল্যাণ বিবেচনা অনুযায়ী কিছু দান করা। (চার) সমগ্র গনীমতের মালামালের মধ্য থেকে কিছু অংশ পৃথক করে নিয়ে সেবাজীবী লোকদের মধ্যে পুরস্কারস্বরূপ দান করা, যারা মুজাহিদ বা সৈনিকদের ঘোড়া প্রভৃতির দেখাশোনা করে এবং তাদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে। – (ইবনে–কাসীর)

তাহলে আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু দাঁড়াল এই যে, এতে আল্লাহ্ তাআলা রসূলে করীম (সাঃ)–কে উদ্দেশ করে বলেছেন যে, আপনার নিকট লোকেরা 'আনফাল' সম্পর্কে প্রশ্ন করে—আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, 'আন্ফাল' সবই হল আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের। অর্থাৎ, নিজস্বভাবে কেউ এসবের অধিকারী কিংবা মালিক নয়। আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে তাঁর রসূল (সাঃ) এগুলোর ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেবেন, তাই কার্যকর হবে।

তাকওয়া ও খোদাভীতি সৌহার্দ্য ও ঐক্যের ভিত্তি ঃ এ আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে। فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ এতে সাহাবায়ে–কেরামকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে ভাল রাখ। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে সে ঘটনার প্রতি যা বদর যুদ্ধে গনীমতের মালামালের বিলি–বন্টনসংক্রান্ত ব্যাপারে সাহাবায়ে–কেরামের মাঝে ঘটে গিয়েছিল। এতে পারস্পরিক তিক্ততা এবং অসন্তুষ্টি সৃষ্টির আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। কাজেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং গনীমতের মালামালের বিলি–বন্টনের বিষয় এ আয়াতের দ্বারা পরে মীমাংসা করে দিয়েছেন। তারপর তাঁদের আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও পারস্পরিক সম্পর্ককে সুন্দর করার উপায় বলা হয়েছে যার কেন্দ্রবিন্দু হল তাকওয়া বা পরহেযগারী এবং খোদাভীতি।

وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ অর্থাৎ,তাকওয়া ও পরহেযগারীর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্কের সংশোধন কর। এরই কিছুটা বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ, তোমরা যদি মুমিনই হবে, তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পূর্ণ আনুগত্য কর। অর্থাৎ, ঈমানের দাবীই হল আনুগত্য। আর আনুগত্যের ফল হল তাকওয়া। কাজেই মানুষ যখন এ বিষয়গুলো লাভ করতে সমর্থ হয়, তখন তাদের পারস্পরিক বিবাদ–বিসংবাদ, লড়াই–ঝগড়া আপনা থেকেই তিরোহিত হয়ে যায় এবং শত্রুতার স্থলে অন্তরে সৃষ্টি হয় প্রেম ও সৌহার্দ্য।

মুমিনের বিশেষ গুণ–বৈশিষ্ট্য ঃ এ আয়াতগুলোতে সে সমস্ত গুণ–বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যা প্রতিটি মুমিনের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রতিটি মুমিন নিজের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার পর্যালোচনা করে দেখবে, যদি তার মধ্যে এসব গুণ–বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তাআলার শুক্রিয়া আদায় করবে যে, তিনি তাকে মুমিনের গুণাবলীতে মণ্ডিত করেছেন। আর যদি এগুলোর মধ্যে কোন একটি গুণ তার মধ্যে না থাকে, কিংবা থাকলেও তা একান্ত দুর্বল বলে মনে হয়, তাহলে তা অর্জন করার কিংবা তাকে সবল করে তোলার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্র ভয় ঃ আয়াতে প্রথম বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ, তাদের সামনে যখন আল্লাহ্র আলোচনা করা হয়, তখন তাদের অন্তর আঁতকে উঠে। অর্থাৎ, তাদের অন্তর আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও প্রেমে ভরপুর, যার দাবী হল ভয় ও ভীতি। কোরআন করীমের অন্য এক আয়াতে তারই আলোচনাক্রমে খোদা– প্রেমিকদিগকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে— وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ, (হে নবী), সুসংবাদ দিয়ে দিন সে সমস্ত বিনয়ী, কোমলপ্রাণ লোকদিগকে, যাদের অন্তর তখন ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে, যখন তাদের সামনে আল্লাহ্র আলোচনা করা হয়। এতদুভয় আয়াতে আল্লাহ্র আলোচনা ও স্মরণের একটা বিশেষ অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; তা হল ভয় ও ত্রাস। আর অপর আয়াতটিতে আল্লাহ্র যিকিরের এই বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাতে অন্তর প্রশান্ত হয়ে উঠে। বলা হয়েছে— اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ অর্থাৎ, আল্লাহ্র যিকিরের দ্বারাই আত্মা শান্তি লাভ করে, প্রশান্ত হয়।

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, আয়াতে যে ভয় ও ভীতির কথা বলা হয়েছে, তা মনের প্রশান্তি এবং স্বস্তির পরিপন্থী নয়, যেমন হিংস্র জীব–জন্তু কিংবা শত্রুর ভয় মানুষের মনের শান্তিকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ্র যিকিরের দরুন অন্তরে সৃষ্ট ভয় তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সেজন্য এখানে خَوْفٌ শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। وجل শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ সাধারণ ভয় নয়; বরং এমন ভয়, যা বড়দের মহত্ত্বের কারণে মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে, এখানে আল্লাহ্র যিকির বা স্মরণ অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তি কোন পাপ কাজে লিপ্ত হতে ইচ্ছা করছিল, তখনই আল্লাহ্র কথা তার স্মরণ হয়ে গেল এবং তাতে সে আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে গেল এবং সে পাপ থেকে বিরত রইল। এ ক্ষেত্রে ভয় অর্থ হবে আযাবের ভয়।— (বাহ্‌রে–মুহীত)

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঈমানের উন্নতি ঃ মুমিনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তার সামনে যখন আল্লাহ্ তাআলার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। সমস্ত আলেম, তফসীরবিদ ও হাদীসবিদগণের সর্বসম্মত মতে, ঈমান বৃদ্ধির অর্থ হলো ঈমানের শক্তি, অবস্থা এবং ঈমানী জ্যোতির উন্নতি। আর একথা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত যে, সৎকাজের দ্বারা ঈমানী শক্তি এবং এমন আত্মিক প্রশা সৃষ্টি হয়, তাতে সৎকর্ম মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন পা পরিহার করতে গেলে খুবই কষ্ট হয় এবং পাপের প্রতি একটা প্রকৃতিগত ঘৃণার উদ্ভব হয়, যার ফলে সে তার কাছেও যেতে পারে না। ঈমানের

অবস্থাকেই হাদীসে 'ঈমানের মাধুর্য' শব্দে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সুতরাং আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, একজন পরিপূর্ণ মুমিনের এমন গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত যে, তার সামনে যখনই আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করা হবে, তখন তার ঈমানের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাবে, তাতে উন্নতি সাধিত হবে এবং সৎকর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে। এতে বোঝা যাচ্ছে, সাধারণ মুসলমানেরা যেভাবে কোরআন পাঠ করে এবং শুনে, যাতে না থাকে কোরআনের আদব ও মর্যাদাবোধের কোন খেয়াল, না থাকে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য, সে ধরনের তেলাওয়াত উদ্দেশ্যও নয় এবং এতে উচ্চতর ফলাফলও সৃষ্টি হয় না। অবশ্য সেটাও সম্পূর্ণভাবে পুণ্য বিবর্জিত নয়।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা : মুমিনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসা করবে। তাওয়াক্কুল অর্থ হল আস্থা ও ভরসা। অর্থাৎ, নিজের যাবতীয় কাজ-কর্ম ও অবস্থায় তার পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা থাকে শুধুমাত্র একক সত্তা আল্লাহ্ তাআলার উপর। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, এর অর্থ এই নয় যে, স্বীয় প্রয়োজনের জন্য জড়-উপকরণ এবং চেষ্টা-চরিত্রকে পরিত্যাগ করে বসে থাকবে। বরং এর অর্থ হলো এই যে, বাহ্যিক জড়-উপকরণকেই প্রকৃত কৃতকার্যতার জন্য যথেষ্ট বলে মনে না করে বরং নিজের সামর্থ্য ও সাহস অনুযায়ী জড়-উপকরণের আয়োজন ও চেষ্টা-চরিত্রের পর সাফল্য আল্লাহ্ তাআলার উপর ছেড়ে দেবে এবং মনে করবে যে, যাবতীয় উপকরণও তাঁরই সৃষ্টি এবং সে উপকরণসমূহের ফলাফলও তিনিই সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ হবেও তাই, যা তিনি চাইবেন। এক হাদীসে বলা হয়েছে اجملوا فی الطلب وتوكلواعلی الله অর্থাৎ, স্বীয় যিকির এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্যে মাঝামাঝি পর্যায়ের অন্বেষণ এবং জড়-উপকরণের মাধ্যমে চেষ্টা করার পর তা আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দাও। নিজের মন-মস্তিস্ককে শুধুমাত্র স্থূল প্রচেষ্টা ও জড়উপকরণের মাঝেই জড়িয়ে রেখো না।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য নামায প্রতিষ্ঠা করা : মুমিনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে নামায প্রতিষ্ঠা করা। এখানে এ বিষয়টি স্মরণ রাখার যোগ্য যে, এখানে 'নামায' পড়ার কথা নয়; বরং নামায প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে اقامت শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোন কিছুকে সোজা দাঁড় করানো। কাজেই اقامت صلوٰة এর মর্মার্থ হচ্ছে নামাযের যাবতীয় আদব-কায়দা, রীতি-নীতি ও শর্তাশর্ত এমনভাবে সম্পাদন করা, যেমন করে রসূলে করীম (সাঃ)স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে বাতলে দিয়েছেন। আদব-কায়দা ও শর্তাশর্তের কোন রকম ত্রুটি হলে তাকে নামায পড়া বলা গেলেও নামায প্রতিষ্ঠা করা বলা যেতে পারে না। কোরআন মজীদে নামাযের যেসব উপকারিতা, প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং বরকতের কথা বলা হয়েছে— যেমন, إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ (অর্থাৎ, নামায লজ্জাহীনতা ও পাপ থেকে বিরত রাখে।) তা নামায প্রতিষ্ঠা করার উপরই নির্ভরশীল। নামাযের আদবসমূহে যখন কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, তখন ফতোয়ার দিক দিয়ে তার সে নামাযকে জায়েয বলা হলেও ত্রুটির পরিমাণ হিসাবে নামাযের বরকত ও কল্যাণে পার্থক্য দেখা দেবে। কোন কোন অবস্থায় তার বরকত বা কল্যাণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হতে হবে।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করা : মর্দে-মুমিনের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাকে যে রিযিক দান করেছেন, তা থেকে আল্লাহ্‌র রাহে খরচ করবে। আল্লাহ্‌র রাহে এই ব্যয় করার অর্থ ব্যাপক। এতে শরীয়ত নির্ধারিত যাকাত-ফেতরা প্রভৃতি,নফল দান-খয়রাতসহ মেহমানদারী, বড়দের কিংবা বন্ধুবান্ধবদের প্রতি কৃত আর্থিক সাহায্য-সহায়তা প্রভৃতি সব রকমের দান-খয়রাতই অন্তর্ভুক্ত।

মর্দে মুমিনের এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে যে, أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا অর্থাৎ, এমনসব লোকই হল সত্যিকার মুমিন যাদের ভেতর ও বাহির এক রকম এবং মুখ ও অন্তর ঐক্যবদ্ধ। অন্যথায় যাদের মধ্যে এসমস্ত বৈশিষ্ট্য অবর্তমান, তারা মুখে اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله বললেও তাদের অন্তরে না থাকে তওহীদের রং, আর না থাকে রসূলের আনুগত্য। তাদের কার্যধারা তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে। কাজেই এ আয়াতে এই ইঙ্গিতই দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক সত্যেরই একটা তাৎপর্য থাকে, তা যখন অর্জিত হয় না, তখন সত্যটিও লাভ হয় না।

কোন এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করেছিল যে, হে আবু সাঈদ! আপনি কি মুমিন? তখন তিনি বললেন, ভাই, ঈমান দু'প্রকার। তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ যদি এই হয়ে থাকে যে, আমি আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও রসূলগণের উপর এবং বেহেশত, দোযখ, কেয়ামত ও হিসাব-কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখি কি না? তাহলে তার উত্তর এই যে, নিশ্চয়ই আমি মুমিন। পক্ষান্তরে সূরা আন্‌ফালের আয়াতে যে মুমিনে কামেল বা পরিপূর্ণ মুমিনের কথা বলা হয়েছে তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ যদি এই হয় যে, আমি তেমন মুমিন কি না? তাহলে আমি তা কিছুই জানি না যে, আমি তার অন্তর্ভুক্ত কি না। সূরা আন্‌ফালের আয়াত বলতে সে আয়াতগুলোই উদ্দেশ যা আপনারা এইমাত্র শুনলেন।

আয়াতগুলোতে সত্যিকার মুমিনের গুণ-বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে— لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ এতে মুমিনদের জন্য তিনটি বিষয়ের ওয়াদা করা হয়েছে। (১) সুউচ্চ মর্যাদা, (২) মাগফেরাত বা ক্ষমা এবং (৩) সম্মানজনক রিযিক।

তফসীরে বাহ্‌রে-মুহীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিনদের যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলো তিন রকম। (১) সেসব বৈশিষ্ট্য যার সম্পর্ক অন্তর ও অভ্যন্তরের সাথে। যেমন, ঈমান, খোদাভীতি,আল্লাহ্‌র উপর ভরসা বা নির্ভরশীলতা, (২) যার সম্পর্ক দৈহিক কার্যকলাপের সাথে। যেমন, নামায, রোযা প্রভৃতি (৩) যার সম্পর্ক ধন-সম্পদের সাথে। যেমন, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা।

এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে তিনটি পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। আত্মিক গুণাবলীর জন্য 'সুউচ্চ মর্যাদা'। সে সমস্ত আমল বা কাজ-কর্মের জন্য 'মাগফেরাত' বা ক্ষমা যেগুলোর সম্পর্ক মানুষের দেহের সাথে। যেমন নামায, রোযা প্রভৃতি। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, নামাযে পাপসমূহের কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। আর 'সম্মান জনক রিযিক'-এর ওয়াদা দেয়া হয়েছে আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করার জন্য। মুমিন এ পথে যা ব্যয় করবে, আখেরাতে সে তদপেক্ষা বহু উত্তম ও বেশী প্রাপ্ত হবে।

সূরার শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সূরা আন্‌ফালের অধিকাংশ বিষয়ই হলো কাফের-মুশরিকদের আযাব ও প্রতিশোধ এবং মুসলমানদের

প্রতি অনুগ্রহ ও পুরস্কার সম্পর্কিত। এতে উভয়পক্ষের জন্যই শিক্ষা ও উপদেশমূলক বিষয় এবং বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। আর এসব বিষয়ের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল বদর যুদ্ধ। এতে বিপুল আয়োজন, সংখ্যাধিক্য ও প্রচুর শক্তি সত্ত্বেও মুশরেকীনরা জান-মালের বিপুল ক্ষতিসহ পরাজয় বরণ করেছে। পক্ষান্তরে মুসলমানরা সর্বপ্রকার স্বল্পতা সত্ত্বেও বিজয়ের গৌরব অর্জন করেছেন।

বদর যুদ্ধের সময় কোন কোন মুসলমান জেহাদের অভিযান পছন্দ করছিলেন না, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ ফরমানের সাহায্যে রসুল করীম (সাঃ)-কে জেহাদাভিযানের নির্দেশ দিলে তারাও তাতে অংশগ্রহণ করেন, যারা ইতিপূর্বে বিষয়টিকে পছন্দ করছিলেন। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে কোরআন করীম এমনসব শব্দ প্রয়োগ করেছে, যেগুলো বিভিন্নভাবে প্রণিধানযোগ্য।

আয়াতটি আরম্ভ করা হয়েছে كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ বাক্য দিয়ে। এতে كَمَا এমন একটি বাক্যাংশ যা তুলনা বা উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রয়োগ করা হয়। অতএব, লক্ষ্য করার বিষয় যে, এখানে কিসের সাথে কিসের তুলনা করা হচ্ছে। তফসীরকার মনীষীবৃন্দ এর বিভিন্ন বিশ্লেষণ করেছেন। তাতে বহুবিধ সম্ভাব্যতা রয়েছে।

এক ঃ এই তুলনার উদ্দেশ এই যে, যেভাবে বদর যুদ্ধে হস্তগত গনীমতের মালামাল বন্টন করার সময় সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর মাঝে পারস্পরিক কিছুটা মতবিরোধ হয়েছিল এবং পরে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ মোতাবেক সবাই মহানবী (সাঃ)-এর হুকুমের প্রতি আনুগত্য করেন এবং তাঁর বরকত ও শুভ পরিণতিসমূহ দেখতে পান, তেমনিভাবে এ জেহাদের প্রারম্ভে কারো পক্ষ থেকে তা অপছন্দ করা হলেও পরে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী সবাই আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং তার শুভফল ও উত্তম পরিণতি দেখতে পায়। এ বিশ্লেষণকে ফাররা ও মুবাররাদ এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া বয়ানুল-কোরআনেও এ বিশ্লেষণকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

দুই ঃ এমন সম্ভাবনাও হতে পারে যে, বিগত আয়াতসমূহে সত্যিকার মুমিনগণের জন্য আখেরাতে সুউচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। অতঃপর এ আয়াতগুলোতে সে সমস্ত প্রতিশ্রুতির অবশ্যম্ভাবিতা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আখেরাতের প্রতিশ্রুতি যদিও এখনই চোখে পড়ে না, কিন্তু বদর যুদ্ধে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি প্রত্যক্ষ করা গেছে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস কর যে, এ পৃথিবীতেই যেভাবে ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়েছে তেমনিভাবে আখেরাতের ওয়াদাও অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। – (কুরতুবী)

তিন ঃ এমনও সম্ভাবনা রয়েছে যা আবু-হাইয়্যান (রহঃ) মুফাসসেরীনদের উক্তি উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন যে, এ সমস্ত উক্তির কোনটির উপরেই আমার পরিপূর্ণ আস্থা ছিল না। একদিন আমি এ আয়াতটির বিষয় চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নে দেখলাম, আমি কোথাও যাচ্ছি এবং আমার সাথে অন্য একটি লোক রয়েছে। আমি সে লোকটির সাথে এ আয়াতের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক করতে গিয়ে বললাম, আমি কখনও এমন জটিলতার সম্মুখীন হইনি, যেমনটি এ আয়াতের ব্যাপারে হয়েছি। আমার মনে হচ্ছে, যেন এখানে কোন একটি শব্দ উহ্য রয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ স্বপ্নের মাঝেই আমার মনে পড়ে গেল যে, এখানে نصرك (নাছারাকা) শব্দটি উহ্য রয়েছে। বিষয়টি আমারও বেশ মনঃপুত ও পছন্দ হল এবং যার সাথে তর্ক করছিলাম সেও পছন্দ করলো। ঘুম থেকে জাগার পর পুনরায় বিষয়টি নিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম। তাতে আমার মনের সন্দেহ বা প্রশ্ন দুর হয়ে গেল। কারণ, এ ক্ষেত্রে كَمَا শব্দটির ব্যবহার উদাহরণ ব্যক্ত করার জন্য থাকে না, বরং কারণ বিশ্লেষণাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। আর তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বদর যুদ্ধের সময় মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকেই যে বিশেষ সাহায্য-সহায়তা নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি হয়েছিল, তার কারণ ছিল এই যে, এই জেহাদে তিনি যা কিছু করেছিলেন তার কোন কিছুই নিজের মতে করেননি, বরং সেসবই করেছিলেন প্রভুর নির্দেশে এবং খোদায়ী হুকুমের প্রেক্ষিতে। তাঁরই হুকুমে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। আল্লাহ্র আনুগত্যের ফলও তাই হওয়া উচিত এবং তাতেই আল্লাহ্র সাহায্য-সহায়তা পাওয়া যায়।

যাহোক,আয়াতে বর্ণিত এই বাক্যটিতে উল্লেখিত তিনটি অর্থেরই সম্ভাবনা রয়েছে এবং তিনটিই যথার্থ বটে।

বস্তুতঃ اَخْرَجَكَ বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জেহাদের উদ্দেশে মহানবী (সাঃ)-এর যাত্রা প্রকৃত প্রস্তাবে যেন আল্লাহ্ তাআলারই যাত্রা ছিল যা হুযুরের মাধ্যমে বাস্তবতা লাভ করেছে বা প্রকাশ পেয়েছে।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এখানে اَخْرَجَكَ رَبُّكَ বলা হয়েছে, যাতে আল্লাহ্র উল্লেখ এসেছে 'রব' 'গুণবাচক' নামে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর এ জেহাদ যাত্রা ছিল পালনকর্তা ও লালনসুলভ গুণেরই দাবী। কারণ, এতে অত্যাচারিত, উৎপীড়িত মুসলমানদের জন্য বিজয় এবং অত্যাচারী, দাম্ভিক কাফেরদের জন্যে আযাবের বিকাশই ছিল উদ্দেশ।

مِنْ بَيْتِكَ এর অর্থ হল আপনার ঘর থেকে। অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা আপনাকে আপনার ঘর থেকে বের করেছেন। অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এই 'ঘর' বলতে মদীনা তাইয়্যেবার ঘর কিংবা মদীনাকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে হিজরতের পর তিনি অবস্থান করছিলেন। কারণ, বদরের ঘটনাটি হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে সংঘটিত হয়েছিল। এরই সঙ্গে بِالْحَقِّ শব্দ ব্যবহার করে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, এই সমুদয় বিষয়টিই সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অসত্যকে প্রতিহত করার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য রাষ্ট্র বা সরকারের মত রাজ্য বিস্তারের লোভ কিংবা রাজন্যবর্গের রাগ-রোষের প্রেক্ষিতে ছিল না। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে – وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ অর্থাৎ, মুসলমানদের কোন একটি দল এ জেহাদ কঠিন মনে করছিল এবং পছন্দ করছিল না। সাহাবায়ে কেরামের মনে এই কঠিনতাবোধ কেমন করে এল, সেকথা উপলব্ধি করার জন্য এবং পরবর্তী অন্যান্য আয়াতগুলো যথাযথভাবে বোঝার জন্য প্রথম গয্ওয়ায়ে বদরের প্রাথমিক অবস্থা ও কারণগুলো জেনে নেয়া প্রয়োজন।

ইবনে-আকাবাহ্ ও ইবনে আমরের বর্ণনা অনুসারে ঘটনাটি ছিল এই যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট মদীনায় এ সংবাদ এসে পৌছে যে, আবু সুফিয়ান একটি বাণিজ্যিক কাফেলাসহ বাণিজ্যিক পণ্য-সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছে। আর এই বাণিজ্যে মক্কার সমস্ত কোরায়েশ অংশীদার। ইবনে-আকাবার বর্ণনা অনুযায়ী মক্কায় এমন কোন

কোরায়েশ নারী বা পুরুষ ছিল না যার অংশ এ বাণিজ্যে ছিল না। কারো কাছে এক মিস্‌কাল (সাড়ে চার মাশা) পরিমাণ সোনা থাকলে, সেও তা এতে নিজের অংশ হিসাবে লাগিয়েছিল। এই কাফেলার মোট পুঁজি সম্পর্কে ইবনে আকাবার বর্ণনা হচ্ছে এই যে, তা পঞ্চাশ হাজার দীনার ছিল। দীনার হল একটি স্বর্ণমুদ্রা যার ওজন সাড়ে চার মাশা। স্বর্ণের দর অনুযায়ী এর মূল্য হয়, বাহান্ন টাকা এবং গোটা পুঁজির মূল্য হয় ছাব্বিশ লক্ষ টাকা। আর তাও আজকের নয়, বরং চৌদ্দ শ' বছর পূর্বেকার ছাব্বিশ লক্ষ যা বর্তমান ছাব্বিশ কোটি অপেক্ষাও অনেক গুণ বেশী হতে পারে। এই বাণিজ্যিক কাফেলার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবসায়ের জন্য সত্তর জন কোরায়েশ যুবক ও সর্দার এর সাথে ছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এই বাণিজ্য কাফেলাটি ছিল কোরায়েশদের একটি বাণিজ্য কোম্পানী।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখের রেওয়ায়েত মতে বগভী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন যে, এই কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কোরায়েশদের চল্লিশ জন ঘোড়সওয়ার সর্দার যাদের মধ্যে আমর ইবনুল আস, মাখরামাহ ইবনে নাওফেল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া একথাও সবাই জানত যে, কোরায়েশদের এই বাণিজ্য এবং বাণিজ্যিক এই পুঁজিই ছিল সবচেয়ে বড় শক্তি। এরই ভরসায় তারা রসূলে করীম (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীসাথীদিগকে উৎপীড়ন করে মক্কা ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল। সে কারণেই হুযুর (সাঃ) যখন সিরিয়া থেকে এই কাফেলা ফিরে আসার সংবাদ পেলেন, তখন তিনি স্থির করলেন যে, এখনই কাফেলার মোকাবেলা করে কোরায়েশদের ক্ষমতাকে ভেঙ্গে দেয়ার উপযুক্ত সময়। তিনি সাহবায়ে কেরামের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তখন ছিল রমযানের মাস। যুদ্ধেরও কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। কাজেই কেউ কেউ সাহস ও শৌর্য প্রদর্শন করলেও অনেকে কিছুটা দোদুল্যমানতা প্রকাশ করলেন। স্বয়ং হুযুর (সাঃ)-ও সবার উপর এ জেহাদে অংশগ্রহণ করাকে অপরিহার্য বা বাধ্যতামূলক হিসেবে সাব্যস্ত করলেন না; বরং তিনি হুকুম করলেন, যাদের কাছে সওয়ারীর ব্যবস্থা রয়েছে,তারা যেন আমাদের সাথে যুদ্ধযাত্রা করেন। তাতে অনেকে যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থেকে যান। আর যাঁরা যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাদের সওয়ারী ছিল গ্রাম এলাকায়, তাঁরা গ্রাম থেকে সওয়ারী আনিয়ে পরে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলেন, কিন্তু এতটা অপেক্ষা করার মত সময় তখন ছিল না। তাই নির্দেশ হল, যাঁদের নিকট এ মুহূর্তে সওয়ারী উপস্থিত রয়েছে এবং জেহাদে যেতে চান, শুধু তাঁরাই যাবেন। বাইরে থেকে সওয়ারী আনিয়ে নেবার মত সময় এখন নেই। কাজেই হুযুর (সাঃ)-এর সাথে যেতে আগ্রহীদের মধ্যেও অল্পই তৈরী হতে পারলেন। বস্তুতঃ যাঁরা এই জেহাদে অংশগ্রহণের আদৌ ইচ্ছাই করেনি, তার কারণও ছিল, তা এই যে, মহানবী (সাঃ) এতে অংশগ্রহণ করা সবার জন্য ওয়াজিব বা অপরিহার্য সাব্যস্ত করেননি। তাছাড়া তাদের মনে এ বিশ্বাসও ছিল যে, এটা একটা বাণিজ্যিক কাফেলা মাত্র, কোন যুদ্ধবাহিনী নয় যার মোকাবেলা করার জন্য রসূলে করীম (সাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদিগকে খুব বেশী পরিমাণ সৈন্য কিংবা মুজাহেদীনের প্রয়োজন পড়তে পারে। কাজেই সাহাবায়ে-কেরামের এক বিরাট অংশ এতে অংশগ্রহণ করেননি।

মহানবী (সাঃ) 'বি'রে সুক্‌ইয়া' নামক স্থানে পৌঁছে যখন কায়েস ইবনে সা'দা'আ (রাঃ)-কে সৈন্য গণনা করার নির্দেশ দেন, তখন তিনি তা গুণে নিয়ে জানান তিন'শ তের জন রয়েছে। মহানবী (সাঃ) এ কথা শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন, তালুতের সৈন্য সংখ্যাও তাই ছিল। কাজেই লক্ষণ শুভ। বিজয় ও কৃতকার্যতারই লক্ষণ বটে। সাহাবায়ে কেরামের সাথে মোট উট ছিল সত্তরটি। প্রতি তিন জনের জন্য একটি, যাতে তারা পালাক্রমে সওয়ারী করেছিলেন। স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে অপর দু'জন একটি উটের অংশীদার ছিলেন। তাঁরা ছিলেন হযরত আবু লুবাবাহ্ ও হযরত আলী (রাঃ)। যখন হুযুর (সাঃ)-এর পায়ে হেঁটে চলার পালা আসতো, তখন তারা বলতেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, আপনি উটের উপরেই থাকুন, আপনার পরিবর্তে আমরা হেঁটে চলব। তাতে রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীনের পক্ষ থেকে উত্তর আসত ঃ না, তোমরা আমার চাইতে বেশী বলিষ্ঠ, আর না আখেরাতের সওয়াবে আমার প্রয়োজন নেই যে, আমার সওয়াবের সুযোগটি তোমাদিগকে দিয়ে দেব। সুতরাং নিজের পালা এলে মহানবী (সাঃ)-ও পায়ে হেঁটে চলতেন।

অপরদিকে সিরিয়ার বিখ্যাত স্থান 'আইনে-যোরকায়' পৌছে এক ব্যক্তি কোরায়েশ কাফেলার নেতা আবু সুফিয়ানকে এ সংবাদ দিল যে, রসূলে করীম (সাঃ) তাদের এ কাফেলার অপেক্ষা করেছেন ; তিনি এর পশ্চাদ্ধাবন করবেন। আবু সুফিয়ান সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করল। যখন কাফেলাটি হেজাযের সীমানায় পৌছাল, তখন বিচক্ষণ ও কর্মক্ষম জনৈক দম্‌দম্ ইবনে ওমরকে কুড়ি মেসকাল সোনা অর্থাৎ, প্রায় দু'হাজার টাকা মজুরী দিয়ে এ ব্যাপারে রাযী করাল যে, সে একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রীতে চড়ে যথাশীঘ্র মক্কা মুকাররমায় গিয়ে এ সংবাদটি পৌছে দেবে যে, তাদের কাফেলা সাহাবায়ে-কেরামের আক্রমণ আশঙ্কার সম্মুখীন হয়েছে।

দম্ দম্ ইবনে ওমর সেকালের বিশেষ রীতি অনুযায়ী আশঙ্কার ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশে তার উষ্ট্রীর নাক-কান কেটে এবং নিজের পরিধেয় পোশাকের সামনা পেছনে ছিঁড়ে ফেলল এবং হাওদাটি উল্টোভাবে উষ্ট্রীর পিঠে বসিয়ে দিল। এটি ছিল সেকালে ঘোর বিপদের চিহ্ন। যখন সে এভাবে মক্কায় এসে ঢুকল, তখন গোটা মক্কা নগরীতে এক হৈ-চৈ পড়ে গেল, সাজ সাজ রব উঠল। সমস্ত কোরাইশ প্রতিরোধের জন্য তৈরী হয়ে গেল। যারা এ যুদ্ধে যেতে পারল, নিজেই অংশগ্রহণ করল। আর যারা কোন কারণে অপারক ছিল, তারা অন্য কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করল। এভাবে মাত্র তিন দিনের মধ্যে সমগ্র কোরাইশ বাহিনী পরিপূর্ণ সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

তাদের মধ্যে যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে গড়িমসি করত, তাদেরকে তারা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত এবং মুসলমানদের সমর্থক বলে মনে করত। কাজেই এ ধরণের লোককে তারা বিশেষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করেছিল। যারা প্রকাশ্যভাবে মুসলমান ছিলেন এবং কোন অসুবিধার দরুন তখনও হিজরত করতে না পেরে মক্কাতে অবস্থান করছিলেন, তাদেরকে এবং বনু-হাশেম গোত্রের যেসব লোকের প্রতি সন্দেহ হতো যে, এরা মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে, তাদেরকেও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল। এ সমস্ত অসহায় লোকদের মধ্যে মহানবী (সাঃ)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং আবু তালেবের দুই পুত্র তালেব ও আকীলও ছিলেন।

যাহোক, এভাবে সব মিলিয়ে এই বাহিনীতে এক হাজার জওয়ান, দু'শ' ঘোড়া ছ'শ' বর্মধারী এবং সারী গায়িকা বাঁদীদল তাদের বাদ্যযন্ত্রাদিসহ বদর অভিমুখে রওনা হল। প্রত্যেক মঞ্জিলে তাদের খাবার জন্য দশটি করে উট জবাই করা হত।

অপরদিকে রসূলে করীম (সাঃ) শুধুমাত্র একটি বাণিজ্যিক কাফেলার মোকাবেলা করার অনুপাতে প্রস্তুতি নিয়ে ১২ই রমযান শনিবার মদীনা তাইয়্যেবা থেকে রওনা হন এবং কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করার পর

বদরের নিকট এসে পৌঁছে দু'জন সাহাবীকে আবু সুফিয়ানের কাফেলার সংবাদ নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দেন।—(মাযহারী)

সংবাদবাহকরা ফিরে এসে জানালেন যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা মহানবীর পশ্চাদ্ধাবনের সংবাদ জানতে পেরে নদীর তীর ধরে অতিক্রম করে চলে গেছে। আর কোরাইশরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও মুসলমানদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য মক্কা থেকে এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে।—(ইবনে-কাসীর)

বলাবাহুল্য, এ সংবাদে অবস্থার মোড় পাল্টে গেল। তখন রসূলে করীম (সাঃ) সঙ্গী সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন যে, আগত এ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা হবে কি না। হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী ও অন্যান্য কতিপয় সাহাবী নিবেদন করলেন, তাদের মোকাবেলা করার মত শক্তি আমাদের নেই। তাছাড়া আমরা এমন কোন উদ্দেশ্য নিয়েও আসিনি। তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং রসূলের নির্দেশ পালনের জন্য নিজেকে নিবেদন করলেন। তারপর হযরত ফারূকে আযম (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং তেমনিভাবে নির্দেশ পালন ও জেহাদের জন্য প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করলেন। অতঃপর মেক্‌দাদ (রাঃ) উঠে নিবেদন করলেনঃ

"ইয়া রসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনি যে ফরমান পেয়েছেন, তা জারি করে দিন, আমরা আপনার সাথে রয়েছি। আল্লাহ্‌র কসম, আমরা আপনাকে এমন উত্তর দেব না, যা বনী-ইসরাঈলরা দিয়েছিল হযরত মূসা (আঃ)-কে। তারা বলেছিল ঃ فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ অর্থাৎ, যান, আপনি ও আপনার রব (পালনকর্তা) গিয়ে লড়াই করুন, আমরা তো এখানেই বসে থাকলাম। সে সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের আবিসিনিয়ার 'বার্কুলগিমাদ' নামক স্থানে নিয়ে যান, তবুও আমরা জেহাদ করার জন্য আপনার সাথে যাব"।

মহানবী (সাঃ) হযরত মেকদাদের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং দোয়া করেন। কিন্তু তখনও আনসারগণের পক্ষ থেকে সহযোগিতার কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। আর এমন একটা সম্ভাবনাও ছিল যে, হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর সাথে আনসারগণের যে সহযোগিতা-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল যেহেতু তা ছিল মদীনার অভ্যন্তরের জন্য, সেহেতু তারা মদীনার বাইরে সাহায্য-সহায়তার ব্যাপারে বাধ্যও ছিলেন না। সুতরাং মহানবী (সাঃ) সভাসদকে লক্ষ্য করে বললেন-বন্ধুগণ, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও যে, আমরা এই জেহাদে মদীনার বাইরে এগিয়ে যাব কি না? এই সম্বোধনের মূল লক্ষ্য ছিলেন আনসারগণ। হযরত সা'দ ইবনে মো'আয আনসারী (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, আপনি কি আমাদিগকে জিজ্ঞেস করছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তখন সা'দ ইবনে মো'আয (রাঃ) বললেনঃ

"ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দান করেছি যে, আপনি যা কিছু বলেন তা সত্য। আমরা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, যে কোন অবস্থায় আপনার আনুগত্য করব। অতএব, আপনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে ফরমান লাভ করেছেন, তা জারি করে দিন। সে সত্তার কসম, যিনি আপনাকে দ্বীনে-হক দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদিগকে সমুদ্রে নিয়ে যান, তবে আমরা আপনার সাথে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের মধ্য থেকে কোন একটি লোকও আপনার কাছ থেকে সরে যাবে না। আপনি যদি কালই আমাদিগকে শত্রুর সম্মুখীন করে দেন, তবুও আমাদের মনে এতটুকু ক্ষোভ থাকবে না। আমরা আশা করি, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের কর্মের মাধ্যমে এমন বিষয় প্রত্যক্ষ করাবেন, যা দেখে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র নামে আমাদিগকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যান।"

এ বক্তব্য শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অত্যন্ত খুশী হলেন এবং স্বীয় কাফেলাকে হুকুম করলেন, আল্লাহ্‌র নামে এগিয়ে যাও। সাথে সাথে এ সুসংবাদও শোনালেন যে, আমাদের আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ওয়াদা করেছেন যে, এ দু'টি দলের মধ্যে একটির উপর আমাদের বিজয় হবে। দু'টি দল বলতে, একটি হল আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা, আর অপরটি হল মক্কা থেকে আগত সৈন্যদল। অতঃপর তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি যেন মুশরিকদের বধ্যভূমি স্বচক্ষে দেখছি।

(—এ সমুদয় ঘটনা তফসীরে ইবনে-কাসীর এবং মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।)

وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ অর্থাৎ, মুসলমানদের একটি দল এই জেহাদকে কঠিন মনে করছিল বলে যে উক্তি করা হয়েছে, তাতে পরামর্শকালে সাহাবায়ে-কেরামের পক্ষ থেকে জেহাদের ব্যাপারে যে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল, সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আর এ ঘটনারই বিশ্লেষণ ব্যক্ত হয়েছে পরবর্তী يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ আয়াতে। অর্থাৎ, এরা আপনার সাথে সত্যের ব্যাপারে বিতর্ক ও বিরোধ করেছে যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যা তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে।

সাহাবায়ে-কেরাম যদিও কোন রকম নির্দেশ লংঘন করেননি ; বরং পরামর্শের উত্তরে নিজেদের দুর্বলতা ও ভীরুতা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু রসূলের সহচরদের কাছ থেকে এহেন মত প্রকাশও তাদের সুউচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র পছন্দ ছিল না, কাজেই অসন্তোষের ভাষায়ই তা বিবৃত করা হয়েছে।

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ
مِّنَ الْمَلَٰٓئِكَةِ مُرْدِفِينَ ⑨ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ
بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ⑩ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم
مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ
الشَّيْطَٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ⑪ إِذْ
يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَٰٓئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ
سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ
الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ⑫ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑬ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَٰفِرِينَ
عَذَابَ النَّارِ ⑭ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ⑮ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ
بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑯

(৯) তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন যে, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে। (১০) আর আল্লাহ্ তো শুধু সুসংবাদ দান করলেন যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত হতে পারে। আর সাহায্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহাশক্তির অধিকারী, হেকমত ওয়ালা। (১১) যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য এবং তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি অবতরণ করেন, যাতে তোমাদিগকে পবিত্র করে দেন এবং যাতে তোমাদের থেকে অপসারিত করে দেন শয়তানের অপবিত্রতা। আর যাতে করে সুরক্ষিত করে দিতে পারেন তোমাদের অন্তরসমূহকে এবং তাতে যেন সুদৃঢ় করে দিতে পারেন তোমাদের পা গুলো। (১২) যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়। (১৩) যেহেতু তারা অবাধ্য হয়েছে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের, সেজন্য এই নির্দেশ। বস্তুতঃ যে লোক আল্লাহ্ ও রসূলের অবাধ্য হয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। (১৪) আপাততঃ বর্তমান এ শাস্তি তোমরা আস্বাদন করে নাও এবং জেনে রাখ যে, কাফেরদের জন্য রয়েছে দোযখের আযাব। (১৫) হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। (১৬) আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত—অন্যরা আল্লাহ্র গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্তুতঃ সেটা হল নিকৃষ্ট অবস্থান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সুরা আন্‌ফালের শুরু থেকেই আল্লাহ্ তা'আলার সে সমস্ত নেয়ামতের আলোচনা চলছে যা তাঁর অনুগত বান্দাদের প্রতি প্রদত্ত হয়েছে। গযওয়ায়ে-বদরের ঘটনাগুলোও সে ধারারই কয়েকটি বিষয়। গযওয়ায়ে-বদরে যেসব নেয়ামত আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে দান করা হয়েছে তার প্রথমটি ছিল এ যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের যাত্রা করা যা كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ আয়াতে বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় নেয়ামত হল ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করার ওয়াদা, যা وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। আর তৃতীয় নেয়ামত দোয়ার মঞ্জুরী ও সাহায্যের ওয়াদা পূরণ। আর তারই আলোচনা করা হয়েছে إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ আয়াতে। উল্লেখিত আয়াতসমূহের প্রথমটিতে রয়েছে চতুর্থ দানের আলোচনা। তাতে মুসলমানদের জন্য দু'টি নেয়ামতের কথা বলা হয়েছে। একটি হল সবার উপর তন্দ্রা নেমে আসার ফলে ক্লান্তি-শ্রান্তি বিদূরিত হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয়টি হল বৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করে দেয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রটিকে তাদের জন্য সমতল আর শত্রুদের জন্য কাদাপূর্ণ করে দেয়া।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, কুফর ও ইসলামের সর্ব প্রথম এই সমর যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তখন মক্কার কাফের বাহিনী প্রথমে সেখানে পৌছে গিয়ে এমন জায়গায় অবস্থান নিয়ে নেয় যা উপরের দিকে ছিল। পানি ছিল তাদের নিকটে। পক্ষান্তরে মহানবী (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম সেখানে পৌছলে তাদেরকে অবস্থান গ্রহণ করতে হয় নিম্নাঞ্চলে। কোরআনে করীম এই যুদ্ধক্ষেত্রের নকশা এ সুরার বিয়াল্লিশতম আয়াতে এভাবে বিবৃত করেছে — إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ এর الْقُصْوَىٰ সবিস্তার বিশ্লেষণ পরবর্তীতে করা হবে।

যেখানে পৌছার পর রসূলে করীম (সাঃ) প্রথম অবস্থান গ্রহণ করেন, সে স্থানের সাথে পরিচিত হযরত হোবাব ইবনে মুন্‌যির (রাঃ) স্থানটিকে যুদ্ধের জন্য অনুপযোগী বিবেচনা করে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! যে জায়গাটি আপনি গ্রহণ করেছেন,তা কি আপনি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে গ্রহণ করেছেন, যাতে আমাদের কিছু বলার কোন অধিকার নেই, না কি শুধুমাত্র নিজের মত ও অন্যান্য কল্যাণ বিবেচনায় বেছে নিয়েছেন? হুযুর আকরাম (সাঃ) বললেন, না, এটা আল্লাহ্র নির্দেশ নয়; এতে পরিবর্তনও করা যেতে পারে। তখন হোবাব ইবনে- মুন্‌যির (রাঃ) নিবেদন করলেন, তাহলে এখান থেকে এগিয়ে গিয়ে মক্কী সর্দারদের বাহিনীর নিকটবর্তী একটি পানিপূর্ণ স্থান রয়েছে, সেটি অধিকার করাই হবে উত্তম। মহানবী (সাঃ) তাঁর এ পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেখানে পৌছে পানির উপর কব্জা করে নেন। একটি হাউজ বানিয়ে তাতে পানির সঞ্চয় গড়ে তোলেন।

এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর হযরত সা'দ ইবনে মো'আয (রাঃ) নিবেদন করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার জন্য কোন একটি সুরক্ষিত স্থানে একটি সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে দিতে চাই। সেখানে আপনি অবস্থান করবেন এবং আপনার সওয়ারীগুলিও আপনার কাছেই থাকবে।

এর উদ্দেশ্য এই যে, আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ করব। আল্লাহ্ যদি আমাদিগকে বিজয় দান করেন, তবে তো এটাই উদ্দেশ্য। আর যদি

খোদানাখাস্তা অন্য কোন অবস্থার উদ্ভব হয়ে যায়, তাহলে আপনি আপনার সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের সাথে গিয়ে মিশবেন, যাঁরা মদীনা-তাইয়্যেবায় রয়ে গেছেন। কারণ, আমার ধারণা, তাঁরাও একান্ত জীবন উৎসর্গকারী এবং আপনার সাথে মহব্বতের ক্ষেত্রে তাঁরাও আমাদের চাইতে কোন অংশে কম নয়। আপনার মদীনা থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাঁরা যদি একথা জানতেন যে, আপনাকে এহেন সুসজ্জিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে, তাহলে তাদের একজনও পেছনে থাকতেন না। আপনি মদীনায় গিয়ে পৌঁছলে তাঁরা হবেন আপনার সহকর্মী। মহানবী (সাঃ) তার এই বীরোচিত প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে দোয়া করলেন এবং তাঁর জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সামিয়ানার ব্যবস্থা করে দেয়া হল। তাতে মহানবী (সাঃ) এবং সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। হযরত মো'আয (রাঃ) তাঁদের হেফাযতের জন্য তরবারি হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে – ছিলেন।

যুদ্ধের প্রথম রাত। তিনশ' তের জন নিরস্ত্র লোকের মোকাবেলা নিজেদের চাইতে তিন গুণ অর্থাৎ, প্রায় এক হাজার লোকের এক বাহিনীর সাথে। যুদ্ধক্ষেত্রের উপযুক্ত স্থানটিও ওদের দখলে। পক্ষান্তরে নিম্নাঞ্চল, তাও বালুময় এলাকা, যাতে চলাফেরাও কষ্টকর, সেটি পড়ল মুসলমানদের ভাগে। স্বাভাবিকভাবেই পেরেশানী ও চিন্তা-দুর্ভাবনা সবারই মধ্যে ছিল; কারো কারো মনে শয়তান এমন ধারণাও সঞ্চার করেছিল যে, তোমরা নিজেদেরকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী কর এবং এখনও আরাম করার পরিবর্তে তাহাজ্জুদের নামাযে ব্যাপৃত রয়েছে। অথচ সবদিক দিয়েই শত্রুরা তোমাদের উপর বিজয়ী এবং ভাল অবস্থায় রয়েছে। এমনি অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের উপর এক বিশেষ ধরনের তন্দ্রা চাপিয়ে দিলেন। তাতে ঘুমানোর কোন প্রবৃত্তি থাক বা নাই থাক জবরদস্তি সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

হাফেযে হাদীস আবু ইয়া'লা উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আলী মুর্তবা (রাঃ) বলেছেন, বদর যুদ্ধের এই রাতে কেউ ছিল না, যে ঘুমায়নি। শুধু রসুলে করীম (সাঃ) সারা রাত জেগে থেকে ভোর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের নামাযে নিয়োজিত থাকেন।

ইবনে-কাসীর বিশুদ্ধ সনদসহ উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) এ রাতে যখন স্বীয় 'আরীশ' অর্থাৎ, সামিয়ানার নীচে তাহাজ্জুদ নামাযে নিয়োজিত ছিলেন তখন তাঁর চোখেও সামান্য তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাসতে হাসতে জেগে ওঠে বলেন, হে আবু বকর ! সুসংবাদ শুন ; এই যে জিবরাঈল (আঃ) টিলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। একথা বলতে বলতে তিনি— سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ আয়াতটি পড়তে পড়তে সামিয়ানার বাইরে বেরিয়ে এলেন। আয়াতের অর্থ এই যে, শীঘ্রই শত্রুপক্ষ পরাজিত হয়ে যাবে এবং পশ্চাদপসরণ করে পালিয়ে যাবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি সামিয়ানার বাইরে এসে বিভিন্ন জায়গার প্রতি ইশারা করে বললেন, এটা আবু জাহলের হত্যা স্থান, এটা অমুকের; সেটা অমুকের। অতঃপর ঘটনা তেমনিভাবে ঘটতে থাকে।— (তফসীরে মাযহারী) আর বদর যুদ্ধে যেমন ক্লান্তি-পরিশ্রান্তি দূর করে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের উপর এক বিশেষ ধরনের তন্দ্রালুতা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি ঘটনা ঘটেছিল ওহুদ যুদ্ধের ক্ষেত্রেও।

সুফিয়ান সওরী (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, যুদ্ধাবস্থায় ঘুম আসাটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শান্তি ও স্বস্তির লক্ষণ, আর নামাযের সময় ঘুম আসাটা শয়তানের পক্ষ থেকে।— (ইবনে-কাসীর)

এ রাতে মুসলমানগণ দ্বিতীয় যে নেয়ামতটি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা ছিল বৃষ্টি। এর ফলে গোটা সমরাঙ্গনের চেহারাই পাল্টে যায়। কোরাইশ সৈন্যরা যে জায়গাটি দখল করেছিল তাতে বৃষ্টি হয় খুবই তীব্র এবং সারা মাঠ জুড়ে কাদা হয়ে গিয়ে চলাচলই দুষ্কর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যেখানে মহানবী (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম অবস্থান করছিলেন, সেখানে বালুর কারণে চলাচল করা ছিল দুষ্কর। বৃষ্টি এখানে অল্প হয়। যাতে সমস্ত বালুকে বসিয়ে দিয়ে মাঠকে অতি সমতল ও আরামদায়ক করে দেয়া হয়।

উল্লেখিত আয়াতে এ দু'টি নেয়ামতের কথাই বলা হয়েছে। (১) নিদ্রা ও (২) বৃষ্টি, যাতে গোটা মাঠের রূপই বদলে যায় এবং দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিদের মন থেকে সে সমস্ত শয়তানী ওসওসা ধুয়ে- মুছে যায় যে, আমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও পরাজিত ও পতিত বলে মনে হচ্ছে, অথচ শত্রুরা অন্যায়ের উপর থেকেও শক্তি-সামর্থ্য ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা চাপিয়ে দিচ্ছিলেন তোমাদিগকে প্রশান্তি দান করার জন্য; আর তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করছিলেন, যেন তোমাদের পবিত্র করে দেন এবং যেন তোমাদের মন থেকে শয়তানী ওসওসা দূর করে দেন। আর যেন তোমাদের মনকে সুদৃঢ় করেন এবং তোমাদেরকে দৃঢ়পদ করেন।

দ্বিতীয় আয়াতে পঞ্চম নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা বদরের সমরাঙ্গনে মুসলমানদের দেয়া হয়েছে। তাহল এই যে, আল্লাহ্ তাআলা যেসব ফেরেশতাকে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন তাঁদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, তোমরা ঈমানদারদিগকে সাহস দান করতে থাক। আমি এখনই কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দিচ্ছি। বস্তুতঃ তোমরা কাফেরদের গর্দানের উপর অস্ত্রের আঘাত হান; তাদের হত্যা কর দলে দলে।

এভাবে ফেরেশতাদিগকে দু'টি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। প্রথমতঃ মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি করবে। একাজটি ফেরেশতাগণ কর্তৃক মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে দলবৃদ্ধি করে কিংবা তাঁদের সাথে মিলে যুদ্ধ করার মাধ্যমেও হতে পারে এবং নিজেদের দৈবক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তরসমূহকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করেও হতে পারে। যাহোক তাঁদের উপর দ্বিতীয় দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যে, ফেরেশতাগণ নিজেরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন এবং কাফেরদের উপর আক্রমণও করবেন। সুতরাং এ আয়াতের দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশতাগণ উভয় দায়িত্বই যথাযথ সম্পাদন করেছেন। মুসলমানদের মনে দৈবক্ষমতা প্রয়োগক্রমে তাদের সাহস ও বল বৃদ্ধিও করেছেন এবং যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। তদুপরি বিষয়টির সমর্থন কতিপয় হাদীসের বর্ণনার দ্বারাও হয়, যা তফসীরে দুররে-মনসুর ও মাযহারীতে সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। তাতে ফেরেশতাদের যুদ্ধ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের চাক্ষুস সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ণনা করা হয়েছে।

আলোচ্য তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুফর ও ইসলামের এ সম্মুখ সমরে যা কিছু ঘটেছে তার কারণ ছিল কুফ্‌ফার কর্তৃক আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ। আর যে লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার উপর আরোপিত হয় আল্লাহ্ তাআলার সুকঠিন

আযাব। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, বদর যুদ্ধে একদিকে মুসলমানদের উপর নাযিল হয়েছে আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতরাজি,অপরদিকে কাফেরদের উপর মুসলমানদের মাধ্যমে আযাব নাযিল করে তাদেরই অসদাচরণের যৎসামান্য শাস্তি দেয়া হয়েছে। অবশ্য তার চেয়ে কঠিন শাস্তি হবে আখেরাতে। আর তাই বলা হয়েছে চতুর্থ আয়াতে — ذٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكٰفِرِينَ عَذَابَ النَّارِ অর্থাৎ, এটা হল আমার যৎসামান্য আযাব; এর আস্বাদ গ্রহণ কর এবং জেনে রাখ যে, এরপরেও কাফেরদের জন্য আরো আযাব আসবে, যা হবে অত্যন্ত কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী ও কল্পনাতীত।

উল্লেখিত ১৫ ও ১৬ আয়াত দু'টিতে ইসলামের একটি সমরনীতি বাতলে দেয়া হয়েছে। ১৫ নং আয়াতে زحف শব্দের মর্মার্থ হল, উভয় বাহিনীর মোকাবেলা ও মুখোমুখি সংঘর্ষ। অর্থাৎ, এমনভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবার পর পশ্চাদপসরণ এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের জন্যে জায়েয নয়।

১৬ নং আয়াতে এই হুকুমের আওতা থেকে একটি অব্যাহতি এবং না-জায়েয পন্থায় পলায়নকারীদের সুকঠিন আযাবের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

দু'টি অবস্থার ক্ষেত্রে অব্যাহতি রয়েছে— إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ অর্থাৎ, যুদ্ধাবস্থায় পশ্চাদপসরণ করা দুই অবস্থায় জায়েয। প্রথমতঃ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এ পশ্চাদপসরণ হবে শুধুমাত্র যুদ্ধের কৌশলস্বরূপ, শত্রুকে দেখাবার জন্য। প্রকৃতপক্ষে এতে যুদ্ধ ছেড়ে পলায়নের কোন উদ্দেশ্য থাকবে না; বরং প্রতিপক্ষকে অসতর্কবস্থায় ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করাই থাকবে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এটাই হল إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ এর অর্থ। কারণ, تحرف অর্থ হয় কোন একদিকে ঝুঁকে পড়া।— (রূহুল-মা'আনী)

দ্বিতীয়তঃ বিশেষ কোন অবস্থা— যাতে সমরক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণের অনুমতি রয়েছে, তাহল এই যে, নিজেদের উপস্থিত সৈন্যদের দুর্বলতা বোধ করে সেজন্যে পেছনের দিকে সরে আসা যাতে মুজাহিদগণ অতিরিক্ত শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করতে সমর্থ হয়। أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ এর অর্থ তাই। কারণ, تحيز এর আভিধানিক অর্থ হল মিলিত হওয়া এবং فِئَةٍ অর্থ দল। কাজেই এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, নিজেদের দলের সাথে মিলিত হয়ে শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করার উদ্দেশে সমরাঙ্গন থেকে পেছনের দিকে সরে আসলে তা জায়েয।

এই স্বতন্ত্রতার বর্ণনার পর সেসব লোকের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যারা এই স্বতন্ত্রাবস্থা ছাড়াই অবৈধভাবে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছে কিংবা পশ্চাদপসরণ করেছে। এরশাদ হয়েছে —

فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

অর্থাৎ, যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যারা পালিয়ে যায় তারা আল্লাহ্ তাআলার গযব নিয়ে ফিরে যায় এবং তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর সেটি হল নিকৃষ্ট অবস্থান।

এ আয়াত দু'টির দ্বারা এই নির্দেশ বোঝা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ সংখ্যা, শক্তি ও আড়ম্বরের দিক দিয়ে যতবেশীই হোক না কেন, মুসলমানদের জন্য তাদের মোকাবেলা থেকে পশ্চাদপসরণ করা হারাম, দু'টি স্বতন্ত্র অবস্থা ব্যতীত। তা হল এই যে, এই পশ্চাদপসরণ পলায়নের উদ্দেশ হবে না ; বরং তা হবে পাঁয়তারা, পরিবর্তন কিংবা শক্তি অর্জনের মাধ্যমে পুরাক্রমণের উদ্দেশে।

বদর যুদ্ধকালে যখন এ আয়াতগুলো নাযিল হয়,তখন এটাই ছিল সাধারণ হুকুম যে, নিজেদের সৈন্য সংখ্যার সাথে প্রতিপক্ষের কোন তুলনা করা না গেলেও পশ্চাদপসরণ কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়া জায়েয নয়। বদর যুদ্ধের অবস্থাও ছিল তাই। মাত্র তিনশ' তের জনকে মোকাবেলা করতে হচ্ছিল তিন গুণ অর্থাৎ, এক হাজারের অধিক সৈন্যের সাথে। তারপরে অবশ্য এই হুকুমটি শিথিল করার জন্য সুরা আন্‌ফালের ৬৫ ও ৬৬ তম আয়াত নাযিল করা হয়। ৬৫তম আয়াতে বিশ জন মুসলমানকে দু'শ' কাফেরের সাথে এবং একশ' মুসলমানকে এক হাজার কাফেরের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়। তারপর ৬৬ তম আয়াতে তা আরো শিথিল করার জন্য এ বিধান অবতীর্ণ হয়— الْـَٔانَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ অর্থাৎ, এখন আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের দুর্বলতার প্রেক্ষিতে এই বিধান জারি করেছেন যে, দৃঢ়চিত্ত মুসলমান যদি একশ' হয় তবে তারা দু'শ' কাফেরের উপর জয়ী হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করে দেয়া হয়েছে যে, নিজেদের দ্বিগুণ সংখ্যক প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় মুসলমানদেরই জয়ী হওয়ার আশা করা যায়। কাজেই এমন ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ করা জায়েয নয়। তবে প্রতিপক্ষের সংখ্যা যদি দ্বিগুণের চেয়ে বেশী হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা জায়েয রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি একা তিন ব্যক্তির মোকাবেলা থেকে পালিয়ে যায়, তা পলায়ন নয়। অবশ্য যে ব্যক্তি দু'জনের মোকাবেলা থেকে পালায় সেই পলাতক বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ, সে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হবে।— (রূহুল-মা'আনী) এখন এই হুকুমই কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

অধিকাংশ উম্মত এবং চার ইমামের মতেও এটাই শরীয়তের নির্দেশ যে, প্রতিপক্ষের সংখ্যা যতক্ষণ না দ্বিগুণের বেশী হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া হারাম ও গোনাহে-কবীরা।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাতটি বিষয়কে মানুষের জন্য মারাত্মক বলেছেন। সেগুলোর মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া অন্তর্ভুক্ত। কাজেই গযওয়ায়ে হুনাইনের ঘটনায় সাহাবায়ে কেরামের প্রাথমিক পশ্চাদপসরণকে কোরআনে করীম একটি শয়তানী পদস্খলন বলে সাব্যস্ত করেছে, যা মহাপাপেরই দলীল। এরশাদ হয়েছে—

إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ

তাছাড়া তিরমিযী ও আবু দাউদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর এক কাহিনী বর্ণিত রয়েছে যে, একবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে মদীনা এসে আশ্রয় নেন এবং মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এই বলে অপরাধ স্বীকার করেন যে, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক অপরাধীতে পরিণত হয়ে পড়েছি। মহানবী (সাঃ) অসন্তোষ প্রকাশের পরিবর্তে তাঁকে সান্ত্বনা দান করলেন। বললেন : بل انتم العكارون وانا فئتكم অর্থাৎ, "তোমরা পলাতক নও ; বরং অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করে

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ
لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ⑰ ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ⑱ اِنْ
تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ
اِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ
وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ⑲ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ⑳ وَلَا
تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ㉑ اِنَّ
شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا
يَعْقِلُوْنَ ㉒ وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ۭ وَلَوْ
اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ㉓ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ
تُحْشَرُوْنَ ㉔ وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ㉕

(১৭) সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহ্ই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ্ স্বয়ং যেন ঈমানদারদের প্রতি এহ্সান করতে পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ শ্রবণকারী; পরিজ্ঞাত। (১৮) এটাতো গেল, আর জেনে রেখো, আল্লাহ্ নস্যাৎ করে দেবেন কাফেরদের সমস্ত কলা-কৌশল। (১৯) তোমরা যদি মীমাংসা কামনা কর, তাহলে তোমাদের নিকট মীমাংসা পৌছে গেছে। আর যদি তোমরা প্রত্যাবর্তন কর, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যদি তাই কর,তবে আমিও তেমনি করব। বস্তুতঃ তোমাদের কোনই কাজে আসবে না তোমাদের দল-বল, তা যত বেশীই হোক। জেনে রেখ, আল্লাহ্ রয়েছেন ঈমানদারদের সাথে। (২০) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না। (২১) আর তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না, যারা বলে যে, আমরা শুনেছি, অথচ তারা শোনে না। (২২) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলার নিকট সমস্ত প্রাণীর তুলনায় তারাই মূক ও বধির, যারা উপলব্ধি করে না। (২৩) বস্তুতঃ আল্লাহ্ যদি তাদের মধ্যে কিছুমাত্র শুভ চিন্তা জানতেন, তবে তাদেরকে শুনিয়ে দিতেন। আর এখনই যদি তাদের শুনিয়ে দেন, তবে তারা মুখ ঘুরিয়ে পালিয়ে যাবে। (২৪) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ্ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুতঃ তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে। (২৫) আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষতঃ শুধু তাদের উপর পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে জালেম এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ্র আযাব অত্যন্ত কঠোর।

পুনর্বার আক্রমণকারী, আর আমি হলাম তোমাদের জন্য সে অতিরিক্ত শক্তি।" এতে মহানবী (সাঃ) এ বাস্তবতাকেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে,তাঁদের পালিয়ে এসে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ সেই স্বাতন্ত্র্যের অন্তর্ভুক্ত যাতে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশে সমরাঙ্গন ত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-ওমর (রাঃ) আল্লাহ্ তাআলার ভয়-ভীতি ও মহত্ত্ব-জ্ঞানের যে সুউচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারই ভিত্তিতে তিনি এই বাহ্যিক পশ্চাদপসরণেও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং সেজন্যই নিজেকে অপরাধী হিসাবে মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত করছিলেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১৭ নং আয়াতে গযওয়ায়ে বদরের অপরাপর ঘটনাবলী বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণকে হেদায়েত দেয়া হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে অধিকের সাথে অল্পের এবং সবলের সাথে দুর্বলের অলৌকিক বিজয়কে তোমরা নিজেদের চেষ্টার ফসল বলে মনে করো না; বরং সে মহান সত্তার প্রতি লক্ষ্য কর; যাঁর সাহায্য-সহায়তা গোটা যুদ্ধেরই চেহারা পাল্টে দিয়েছে।

এ আয়াতে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তারই বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইবনে জরীর ও হযরত বায়হাকী (রহঃ) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, বদর যুদ্ধের দিনে যখন মক্কার এক হাজার জওয়ানের বাহিনী টিলার পেছন দিক থেকে ময়দানে এসে উপস্থিত হয়, তখন মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা একান্ত গর্বিত ও সদম্ভ ভঙ্গীতে উপস্থিত হয়। সে সময় রসূলে করীম (সাঃ) দোয়া করেন, "ইয়া আল্লাহ্, আপনাকে মিথ্যা জ্ঞানকারী এই কোরাইশরা গর্ব ও দম্ভ নিয়ে এগিয়ে আসছে, আপনি বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছেন, তা যথা শীঘ্র পূরণ করুন।"— (রূহুল-বয়ান) তখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) অবতীর্ণ হয়ে নিবেদন করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ আপনি এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে শত্রুবাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করুন। তিনি তাই করলেন। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে-হাতেম হযরত ইবনে-যায়েদের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সাঃ) তিন বার মাটি ও কাঁকরের মুঠো তুলে নেন এবং একটি শত্রুবাহিনীর ডান অংশের উপর, একটি বাম অংশের উপর এবং একটি সামনের দিকে নিক্ষেপ করেন। তার ফল দাঁড়ায় এই যে, সেই এক কিংবা তিন মুষ্ঠি কাঁকরকে আল্লাহ্ একান্ত ঐশীভাবে এমন বিস্তৃত করে দেন যে, প্রতিপক্ষের সৈন্যদের এমন একটি লোকও বাকী ছিল না,যার চোখে অথবা মুখমণ্ডলে এই ধূলি ও কাঁকর পৌছেনি। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় গোটা শত্রুবাহিনীর মাঝে এক ভীতির সঞ্চার হয়ে যায়। আর এই সুযোগে মুসলমানরা তাদের ধাওয়া করে। ফেরেশতাগণ পৃথকভাবে তাঁদের সাথে যুদ্ধে শরীক ছিলেন।— (মাযহারী, রূহুল-বয়ান)

শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের কিছু লোক নিহত হয়, কিছু হয় বন্দী; আর বাকী সবাই পালিয়ে যায় এবং ময়দান চলে আসে মুসলমানদের হাতে।

সম্পূর্ণ নৈরাশ্য ও হতাশার মধ্যে মুসলমানগণ এই মহান বিজয় লাভে সমর্থ হন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসার পর তাদের মধ্যে এ প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়। সাহাবায়ে—কেরাম একে অপরের কাছে নিজ নিজ কৃতিত্বের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে নাযিল হয় فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ আয়াত। এতে তাঁদেরকে হেদায়েত দান

হয় যে, কেউ নিজের চেষ্টা-চরিত্রের জন্য গর্ব করো না; যা কিছু আছে তা শুধুমাত্র তোমাদের পরিশ্রম ও চেষ্টারই ফসল নয়; বরং এটা আল্লাহ্ তাআলার একান্ত সাহায্য ও সহায়তারই ফল। তোমাদের হাতে সব শত্রু নিহত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে তোমরা হত্যা করনি ; বরং আল্লাহ্ তাআলাই হত্যা করেছেন।

এমনিভাবে রসূলে করীম (সাঃ)-কে উদ্দেশ করে এরশাদ হয়েছে وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ অর্থাৎ, আপনি যে কাঁকরের মুঠো নিক্ষেপ করেছেন প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং স্বয়ং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছেন। সারমর্ম হচ্ছে, যে, কাঁকর নিক্ষেপের এই ফলাফল যে, তা প্রতিটি শত্রু সৈন্যের চোখে পৌঁছে গিয়ে সবাইকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেয়, এটা আপনার নিক্ষেপের প্রভাবে হয়নি ; বরং স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কুদরতের দ্বারা এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন।

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, মুসলমানদের জন্য জেহাদে বিজয় লাভের চাইতেও অধিক মূল্যবান ছিল এই হেদায়েতটি যা তাদের মনমানসকে উপকরণ থেকে ফিরিয়ে উপকরণের স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয় এবং তাতে করে এমন অহংকার ও আত্মগর্বের অভিশাপ থেকে তাঁদেরকে মুক্তি দান করে, যার নেশায় সাধারণতঃ বিজয়ী সম্প্রদায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারপর বলে দেয়া হয়েছে যে, জয়-পরাজয় আমারই হুকুমের অধীন। আর আমার সাহায্য ও বিজয় তারাই লাভ করে যারা অনুগত। وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا অর্থাৎ, আমি মুমিনগণকে এই মহাবিজয় দিয়েছি তাদের পরিশ্রমের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়ার উদ্দেশে। بَلَاءً এর শব্দগত অর্থ হল পরীক্ষা। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাআলার পরীক্ষা কখনো হয় বিপদাপদের সম্মুখীন করে, আবার কখনো হয় ধন-দৌলত ও সাহায্য-বিজয় দানের মাধ্যমে। بلاء حسن বলা হয় এমন পরীক্ষাকে যা আয়েশ-আরাম, ধন-সম্পদ ও সাহায্য দানের মাধ্যমে নেয়া হয়। এতে দেখা হয় যে, এরা একে আমার অনুগ্রহের দান মনে করে শুকরিয়া আদায় করে, নাকি একে নিজেদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার ফল ধারণা করে গর্ব ও অহঙ্কারে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং কৃত আমলকে বরবাদ করে দেয়। কারণ, আল্লাহ্ তাআলার দরবারে কারও গর্বাহঙ্কারের কোন অবকাশ নেই।

পরবর্তী আয়াতে এর পাশাপাশি এই বিজয়ের আরও একটি উপকারিতার কথা বাতলে দেয়া হয়েছে যে, ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ অর্থাৎ, মুসলমানদিগকে এ বিজয় এ কারণেই দেয়া হয়েছে যেন এর মাধ্যমে কাফেরদের পরিকল্পনা ও কলা-কৌশলসমূহকে নস্যাৎ করে দেয়া যায় এবং যাতে কাফেররা একথা উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ্ তাআলার সহায়তা আমাদের প্রতি নেই এবং কোন কলা-কৌশল তথা পরিকল্পনাই আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য ছাড়া কৃতকার্য হতে পারে না।

পঞ্চম আয়াতে পরাজিত কোরায়েশী কাফেরদের সম্বোধন করে একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা মুসলমানদের সাথে মোকাবেলা করার উদ্দেশে কোরায়শ বাহিনীর মক্কা থেকে বেরোবার সময় ঘটেছিল।

ঘটনাটি এই যে, কোরায়েশ কাফেরদের বাহিনী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশে প্রস্তুতি নেয়ার পর মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে বাহিনী প্রধান আবু জাহ্ল প্রমুখ বায়তুল্লাহ্র পর্দা ধরে প্রার্থনা করেছিল। আর আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই দোয়া করতে গিয়ে তারা নিজেদের বিজয়ের দোয়ার পরিবর্তে সাধারণ বাক্যে এভাবে দোয়া করেছিল ঃ

ইয়া আল্লাহ্! উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি উত্তম ও উচ্চতর, উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি বেশী হেদায়েতের উপর রয়েছে এবং উভয় দলের যেটি বেশী ভদ্র ও শালীন এবং উভয়ের মধ্যে যে ধর্ম উত্তম তাকেই বিজয় দান করো।'—(মাযহারী)

এই নির্বোধেরা এ কথাই ভাবছিল যে, মুসলমানদের তুলনায় আমরাই উত্তম ও উচ্চতর এবং অধিক হেদায়েতের উপর রয়েছি, কাজেই এ দোয়াটি আমাদেরই অনুকূলে হচ্ছে। আর এই দোয়ার মাধ্যমে তারা কামনা করছিল, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যেন হক ও বাতেল তথা সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা হয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিল, যখন আমরা বিজয় অর্জন করব, তখন এটাই হবে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের সত্যতার ফয়সালা।

কিন্তু তারা একথা জানত না যে, এই দোয়ার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের জন্য বদদোয়া ও মুসলমানদের জন্য নেক-দোয়া করে যাচ্ছে। যুদ্ধের ফলাফল সামনে আসার পর কোরআনে করীম তাদের বাতলে দিল إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ অর্থাৎ, তোমরা যদি ঐশী মীমাংসা কামনা কর, তবে তা সামনে এসে গেছে। সত্যের জয় এবং মিথ্যার পরাজয় সূচিত হয়েছে। وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ অর্থাৎ, আর যদি তোমরা এখনও কুফরীজনিত শত্রুতা পরিহার কর, তাহলে তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর। وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ আর তোমরা আবারো যদি নিজেদের দুষ্টামী ও যুদ্ধের দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও মুসলমানদের সাহায্যের দিকে ফিরে যাব। وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ অর্থাৎ, তোমাদের দল ও জোট যতই অধিক হোক না কেন, আল্লাহ্র সাহায্যের মোকাবেলায় তা কোন কাজেই লাগবে না। وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ যখন মুসলমানদের সাথে রয়েছেন, তখন কোন দল তোমাদের কিই বা কাজে লাগতে পারে?

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ অর্থাৎ, সর্বপ্রকার উপকরণ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও মক্কার মুশরিকদের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ ছিল আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা। এতে সে সমস্ত লোকের জন্য এক চরম শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে, যারা আসমান-যমীনের স্রষ্টা ও একচ্ছত্র মালিকের পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও গায়েবী শক্তিকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র স্থূল ও জড়-উপকরণ এবং শক্তির উপর নির্ভর করে থাকে, কিংবা আল্লাহ্র না-ফরমানী করা সত্ত্বেও তাঁর সাহায্য লাভের ভ্রান্ত আশার মাধ্যমে নিজের সাথে প্রতারণা করে।

উল্লেখিত আয়াতে এরই দ্বিতীয় আরেকটি দিক মুসলমানদের সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে তা হল এই যে, মুসলমানগণ তাদের সংখ্যাল্পতা ও নিঃসম্বলতা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সাহায্যের মাধ্যমেই এহেন বিপুল বিজয় অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। আর এই যে সাহায্য, এটা হল আল্লাহ্র প্রতি তাঁদের আনুগত্যের ফল। এই আনুগত্যের উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকার জন্য মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য অবলম্বন কর এবং তাতে স্থির থাক। অতঃপর

এ বিষয়টির প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ অর্থাৎ, কোরআন ও সত্যের বাণী শুনে নেবার পরেও তোমরা আনুগত্য–বিমুখ হয়ো না।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ অর্থাৎ, তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা মুখে একথা বলে সত্য যে; আমরা শুনে নিয়েছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই শুনেনি। 'সে সমস্ত লোক' বলতে উদ্দেশ হল সাধারণ কাফেরকুল, যারা শোনার দাবী করে বটে, কিন্তু বিশ্বাস করে বলে দাবী করে না এবং এতে মুনাফেকও উদ্দেশ যারা শোনার সাথে সাথে বিশ্বাসেরও দাবীদার, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা এবং সঠিক উপলব্ধি থেকে এতদুভয় সম্প্রদায়ই বঞ্চিত। কাজেই তাদের এই শ্রবণ না শোনারই শামিল। মুসলমানদিগকে এদের অনুরূপ হতে বারণ করা হয়েছে।

তৃতীয় আয়াতে সে সমস্ত লোকের কঠিন নিন্দা করা হয়েছে, যারা সত্য ও ন্যায়ের বিষয় গভীর মনোযোগ ও নিবিষ্টতার সাথে শ্রবণ করে না এবং তা কবুলও করে না। এহেন লোককে কোরআনে করীম চতুষ্পদ জীব–জন্তু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করেছে। এরশাদ করেছেঃ

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

الدَّوَابِّ শব্দটি دابة এর বহুবচন। অভিধান অনুযায়ী যমীনের উপর বিচরণকারী প্রতিটি জীবকেই دابة বলা হয়। কিন্তু সাধারণ প্রচলন ও পরিভাষায় دابة বলা হয় শুধুমাত্র চতুষ্পদ জন্তুকে। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ্‌র নিকট সে সমস্ত লোকই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও চতুষ্পদ জীবতুল্য যারা সত্য ও ন্যায়ের শ্রবণের ব্যাপারে বধির এবং তা গ্রহণ করার ব্যাপারে মুক। বস্তুতঃ মুক ও বধিরদের মধ্যে, সামান্য বুদ্ধি থাকলেও তারা ইঙ্গিত–ইশারায় নিজেদের মনের কথা ব্যক্ত করে এবং অন্যের কথা উপলব্ধি করে নেয়। অথচ এরা মুক ও বধির হওয়ার সাথে সাথে নির্বোধও বটে। বলাবাহুল্য, যে মুক–বধির বুদ্ধি বিবির্জিতও হবে, তাকে বুঝবার এবং বুঝাবার কোনই পথ থাকে না।

এ আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মানুষকে যে فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (সুগঠিত অঙ্গ সৌষ্ঠব) দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সৃষ্টির সেরা ও বিশ্বের বরেণ্য করা হয়েছে এই যাবতীয় এন্‌আম ও কৃপা শুধু সত্যের আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। যখন মানুষ সত্য ও ন্যায়কে শুনতে, উপলব্ধি করতে এবং তা মেনে নিতে অস্বীকার করে, তখন এই সমুদয় পুরস্কার ও কৃপা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং তার ফলে সে জানোয়ার অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

তফসীরে রূহুল–বয়ান গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, মানুষ প্রকৃত সৃষ্টির দিক দিয়ে সমস্ত জীব–জানোয়ার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ফেরেশতা অপেক্ষা নিম্ন মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু যখন সে তার অধ্যাবসায়, আমল ও সত্যানুগত্যের সাধনায় ব্রতী হয়, তখন ফেরেশতা অপেক্ষাও উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি সত্যানুগত্যে বিমুখ হয়, তখন নিকৃষ্টতার সর্বনিম্ন পর্যায়ে উপনীত হয় এবং জানোয়ার অপেক্ষাও অধম হয়ে যায়।

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যদি তাদের মধ্যে সামান্যতম কল্যাণকর দিক তথা সৎচিন্তা দেখতেন, তবে তাদেরকে বিশ্বাস সহকারে শোনার সামর্থ্য দান করতেন কিন্তু বর্তমান সত্যানুরাগ না থাকা অবস্থায় যদি আল্লাহ্ তাআলা সত্য ও ন্যায় কথা তাদেরকে শুনিয়ে দেন, তাহলে তারা অনীহাভরে তা থেকে বিমুখতা অবলম্বন করবে।

এখানে কল্যাণকর দিক বা সৎচিন্তা বলতে সত্যানুরাগ বুঝানো হয়েছে। কারণ, অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমেই চিন্তা–ভাবনা ও উপলব্ধির দ্বারা উদঘাটিত হয় এবং এতেই বিশ্বাস ও আমলের সামর্থ্য লাভ হয়। পক্ষান্তরে যার মাঝে সত্যানুরাগ বা অনুসন্ধিৎসা নেই, তাতে যেন কোন রকম কল্যাণ নেই। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যদি কোন রকম ভালাই থাকত, তবে তা আল্লাহ্ তাআলার অবশ্যই জানা থাকত। যখন আল্লাহ্ তাআলার জানা মতে তাদের মধ্যে কোন ভালাই তথা সৎচিন্তা নেই, তখন একথাই প্রতীয়মান হল যে, প্রকৃতপক্ষেই তারা যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। আর এই প্রবঞ্চিত অবস্থায় তাদেরকে যদি চিন্তা–ভাবনা ও সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানো হয়, তবে তারা কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করবে না, বরং তা থেকে মুখ ফিরিয়েই নেবে। অর্থাৎ, তাদের এই বিমুখতা এ কারণে হবে না যে, তারা দ্বীনের মধ্যে কোন আপত্তিকর বিষয় দেখতে পেয়েছে, সে জন্যই তা গ্রহণ করেনি; বরং প্রকৃতপক্ষে তারা সত্যের বিষয় কোন লক্ষ্যই করেনি।

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ অর্থাৎ, জেনে রাখ, আল্লাহ্ তাআলা মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন। এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে এবং উভয়টির মধ্যেই বিরাট তাৎপর্য ও শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া যায়, যা প্রতিটি মানুষের পক্ষে সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা কর্তব্য।

একটি অর্থ এই হতে পারে যে, যখনই কোন সৎকাজ করার কিংবা পাপ থেকে বিরত থাকার সুযোগ আসে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তা করে ফেলো; এতটুকু বিলম্ব করো না এবং অবকাশকে গনীমত জ্ঞান কর। কারণ, কোন কোন সময় মানুষের ইচ্ছার মাঝে আল্লাহ্ নির্ধারিত কাযা বা নিয়তি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং সে তখন আর নিজের ইচ্ছায় সফল হতে পারে না। কোন রোগ–শোক, মৃত্যু কিংবা এমন কোন কাজ উপস্থিত হয়ে যেতে পারে, যাতে সে কাজ করার আর অবকাশ থাকে না। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হল আয়ু এবং সময়ের অবকাশকে গনীমত মনে করা। আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে না রাখা। কারণ, একথা কারোই জানা নেই, কাল কি হবে।

তাছাড়া এ বাক্যের দ্বিতীয় মর্ম এও হতে পারে যে, এতে আল্লাহ্ তাআলা যে বন্দার অতি সন্নিকটে তাই বলে দেয়া হয়েছে। যেমন, অন্য আয়াত وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ এতে আল্লাহ্ তাআলা যে মানুষের জীবন শিরার চেয়েও নিকটবর্তী সেকথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

সারকথা এই যে, মানবাত্মা সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যখনই তিনি কোন বন্দাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতে চান, তখন তিনি তার অন্তর ও পাপের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেন। আবার যখন কারও ভাগ্যে অমঙ্গল থাকে, তখন তার অন্তর ও সৎকর্মের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেয়া হয়। সে কারণেই রসূলে করীম (সাঃ) অধিকাংশ সময় এই দোয়া করতেন– يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك অর্থাৎ, হে অন্তরসমূহের বিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ
اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ
مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (٢٦) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا
تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٢٧)
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ
عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ (٢٨) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ
يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَ
اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (٢٩) وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ۗ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۗ
وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ (٣٠) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا
قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ
اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ (٣١) وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا
هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ
اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (٣٢) وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ
فِيْهِمْ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ (٣٣)

(২৬) আর স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে অল্প, পরাজিত অবস্থায় পড়েছিলে দেশে; ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলে যে, তোমাদের না অন্যেরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয়ের ঠিকানা দিয়েছেন, স্বীয় সাহায্যের দ্বারা তোমাদিগকে শক্তি দান করেছেন এবং পরিচ্ছন্ন জীবিকা দিয়েছে যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। (২৭) হে ঈমানদারগণ, খেয়ানত করোনা আল্লাহ্‌র সাথে ও রসূলের সাথে এবং খেয়ানত করো না নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে-শুনে। (২৮) আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অকল্যাণের সম্মুখীনকারী। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে মহা সওয়াব। (২৯) হে ঈমানদারগণ। তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক, তবে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন এবং তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অত্যন্ত মহান। (৩০) আর কাফেরেরা যখন প্রতারণা করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য, তখন তারা যেমন ছলনা করত তেমনি, আল্লাহ্‌ও ছলনা করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র ছলনা সবচেয়ে উত্তম। (৩১) আর কেউ যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে তবে বলে, আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এমন বলতে পারি, এ তো পূর্ববর্তী ইতিকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। (৩২) তাছাড়া তারা যখন বলতে আরম্ভ করে যে, ইয়া আল্লাহ্, এই যদি তোমার পক্ষ থেকে (আগত) সত্য দ্বীন হয়ে থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদের উপর বেদনাদায়ক আযাব নাযিল কর। (৩৩) অথচ আল্লাহ্ কখনই তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন। তাছাড়া তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে আল্লাহ্ কখনও তাদের উপর আযাব দেবেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআনে করীম গযওয়ায়ে বদরের কিছু বিস্তারিত বিবরণ এবং তাতে মুসলমানদের প্রতি নাযিলকৃত এন্‌আমসমূহের উল্লেখের পর তা থেকে অর্জিত ফলাফল এবং অতঃপর সে প্রসঙ্গে মুসলমানদের প্রতি কিছু উপদেশ দান করেছে يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ আয়াত থেকে তা আরম্ভ হয়। আলোচ্য এ আয়াতগুলো তারই কয়েকটি আয়াত।

এর মধ্যে প্রথম আয়াতটিতে এমন সব পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিশেষভাবে হেদায়েত করা হয়েছে, যার জন্য নির্ধারিত সুকঠিন আযাব শুধু পাপীদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং পাপ করেনি এমন লোকও তাতে জড়িয়ে পড়ে।

সে পাপ যে কি, সে সম্পর্কে তফসীরবিদ ওলামায়ে-কেরামের বিভিন্ন মত রয়েছে। কোন কোন মনীষী বলেন, ‘আম্‌র বিল্ মা’রূফ’ তথা সৎকাজের নির্দেশ দান এবং ‘নাহী আনিল মুনকার’ অর্থাৎ, অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত করার চেষ্টা পরিহার করাই হল এই পাপ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা নিজের এলাকায় কোন অপরাধ ও পাপানুষ্ঠান হতে না দেয়। কারণ, যদি তারা এমন না করে, অর্থাৎ, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অপরাধ ও পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হতে দেখে তা থেকে বারণ না করে, তবে আল্লাহ্ স্বীয় আযাব সবার উপরই ব্যাপক করে দেন। তখন তা থেকে না বাঁচতে পারে কোন গোনাহ্‌গার, আর না বাঁচতে পারে নিরপরাধ।

এখানে ‘নিরপরাধ’ বলতে সেসব লোককেই বুঝানো হচ্ছে যারা মূল পাপে পাপীদের সাথে অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু তারাও ‘আম্‌র বিল মা’রূফ’ বর্জন করার পাপে পাপী। কাজেই এ ক্ষেত্রে এমন কোন সন্দেহ করার কারণ নেই যে, একজনের পাপের জন্য অন্যের উপর আযাব করাটা অবিচার এবং কোরআনী সিদ্ধান্ত وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى এর পরিপন্থী। কারণ, এখানে পাপী তার মূল পাপের পরিণতিতে এবং নিরপরাধরা তাদের ‘আম্‌র বিল মা’রূফ’ থেকে বিরত থাকার পাপের দরুন ধরা পড়েছে, কারো পাপ অন্যের কাঁধে চাপানো হয়নি।

ইমাম বগভী (রহঃ) ’শরহুস্‌সুন্নাহ’ ও ‘মা’আলিম’ নামক গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-মসউদ (রাঃ) ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা কোন নির্দিষ্ট দলের পাপের আযাব সাধারণ মানুষের উপর আরোপ করেন না, যতক্ষণ না এমন কোন অবস্থার উদ্ভব হয় যে, সে নিজের এলাকায় পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হতে দেখে তা বাধাদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাতে বাধা দেয়না, তবেই আল্লাহ্‌র আযাব সবাইকে ঘিরে ফেলে।

তিরমিযী ও আবু-দাউদ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদসহ উদ্ধৃত রয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর এক ভাষণে বলেছেন যে, আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, মানুষ যখন কোন অত্যাচারীকে দেখেও অত্যাচার থেকে তার হাতকে প্রতিরোধ করবে না, শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদের সবার উপর ব্যাপক আযাব নাযিল করবেন।

সহীহ বোখারীতে হযরত নু’মান ইবনে বশীর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, যারা আল্লাহ্‌র কানুনের সীমালংঘনকারী গোনাহগার এবং যারা তাদের দেখেও

মৌনতা অবলম্বন করে, অর্থাৎ, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে সেই পাপানুষ্ঠান থেকে বাধা দান করে না, এতদুভয় শ্রেণীর উদাহরণ এমন একটি সামুদ্রিক জাহাজের মত যাতে দু'টি শ্রেণী রয়েছে এবং নীচের শ্রেণীর লোকেরা উপরে উঠে এসে নিজেদের প্রয়োজনে পানি নিয়ে যায়, যাতে উপরের লোকেরা কষ্ট অনুভব করে। নীচের লোকেরা এমন অবস্থা দেখে জাহাজের তলায় ছিদ্র করে নিজেদের কাজের জন্য পানি সংগ্রহ করতে শুরু করে। কিন্তু উপরের লোকেরা এহেন কাণ্ড দেখেও বারণ করে না। এতে বলাইবাহুল্য যে, গোটা জাহাজেই পানি ঢুকে পড়বে। আর তাতে নীচের লোকেরা যখন ডুবে মরবে, তখন উপরের লোকেরাও বাঁচতে পারবে না।

এসব রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে অনেক তফসীরবিদ মনীষী সাব্যস্ত করেছেন যে, এ আয়াতে فِتْنَةً (ফিৎনাহ) বলতে 'এই পাপ' অর্থাৎ, 'সৎকাজে নির্দেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা দান' বর্জনকেই বুঝানো হয়েছে।

তফসীরে-মাযহারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, 'এই' বলতে উদ্দেশ হল জেহাদ বর্জন করা। বিশেষ করে এমন সময়ে জেহাদ থেকে বিরত থাকা, যখন আমিরুল-মু'মেনীন তথা মুসলমানদের নেতার পক্ষ থেকে জেহাদের জন্য সাধারণ মুসলমানদের প্রতি আহবান জানানো হয় এবং ইসলামী '`শয়ার'সমূহের হেফাযতও তার উপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, তখন জেহাদ বর্জনের পরিণতি শুধু জেহাদ বর্জনকারীদের উপরই নয়; বরং সমগ্র মুসলিম জাতির উপর এসে পড়ে। কাফেরদের বিজয়ের ফলে নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং অন্যান্য বহু নিরপরাধ মুসলমান হত্যার শিকারে পরিণত হয়। তাদের জান-মাল বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় 'আযাব' অর্থ হবে পার্থিব বিপদাপদ।

আর যেহেতু আল্লাহ্ ও বান্দার হকসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে গাফেলতী ও শৈথিল্যের কারণ সাধারণতঃ মানুষের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিই হয়ে থাকে, কাজেই সে সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ, জেনে রেখো যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফেৎনা।

'`ফৎনা', শব্দের অর্থ পরীক্ষাও হয়; আবার আযাবও হয়। তাছাড়া এমনসব বিষয়কেও ফেৎনা বলা হয় যা আযাবের কারণ হয়ে থাকে। কোরআন করীমের বিভিন্ন আয়াতে এই তিন অর্থেই ফেৎনা শব্দের ব্যবহার হয়েছে। বস্তুতঃ এখানে তিনটি অর্থেরই সুযোগ রয়েছে। কোন কোন সময় সম্পদ ও সন্তান মানুষের জন্য পৃথিবীতেই প্রাণ শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং সেগুলোর জন্য শৈথিল্য ও পাপে লিপ্ত হয়ে আযাবের কারণ হয়ে পড়াটা একান্তই স্বাভাবিক। প্রথমতঃ ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করাই আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ যে, আমার এসব দান গ্রহণ করার পর তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, না অকৃজ্ঞ হও। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মায়ায় জড়িয়ে গিয়ে যদি আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করা হয়, তবে এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিই তোমাদের জন্য আযাব হয়ে দাঁড়াবে। কোন সময় তো পার্থিব জীবনেই এসব বস্তু মানুষকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন করে দেয় এবং দুনিয়াতে সে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিকে আযাব বলে মনে করতে শুরু করে। অন্যথায় একথাটি অপরিহার্য যে, যে ধন-সম্পদ দুনিয়ায় আল্লাহ্ তাআলার হুকুম-আহ্‌কামের বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে কিংবা ব্যয় করা হয়েছে, সে সম্পদই আখেরাতে তার জন্য সাপ, বিচ্ছু ও আগুনে পোড়ার কারণ হবে। যেমন, কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও অসংখ্য হাদীসে তার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। আর তৃতীয় অর্থ এই যে, এসব বস্তু-সামগ্রী আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এবিষয়টি তো একান্তই স্পষ্ট যে, এসব বস্তু আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে গাফেল করে তোলে এবং তাঁর হুকুম-আহ্‌কামের প্রতি অমনোযোগী করে দেয়, তখন সেগুলোই আযাবের কারণ হয়। আয়াত শেষে বলা হয়েছে وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ, এ কথাটিও জেনে রেখো যে, যে লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে গিয়ে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসার সামনে পরাজয় বরণ না করবে তার জন্য আল্লাহ্ তাআলার নিকট রয়েছে মহান প্রতিদান।

পূর্ববর্তী আয়াতে এ বিষয়ের আলোচনা হচ্ছিল যে, মানুষের জন্য ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি একটি ফেৎনাবিশেষ। অর্থাৎ, এগুলো সবই পরীক্ষার বিষয়। কারণ, এসব বস্তুর মায়ায় হেরে গিয়েই মানুষ সাধারণতঃ আল্লাহ্ এবং আখেরাতের প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে। অথচ এই মহানেয়ামতের যৌক্তিক দাবী ছিল, আল্লাহ্‌র এহেন মহা অনুগ্রহের জন্য তাঁর প্রতি অধিকতর বিনত হওয়া।

আলোচ্য এ আয়াতসমূহের প্রথমটি সে বিষয়েরই উপসংহার। এতে বলা হয়েছে, যে লোক বিবেককে স্বভাবের উপর প্রবল রেখে এই পরীক্ষায় দৃঢ়তা অবলম্বন করবে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও মহব্বতকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থাপন করবে—যাকে কোরআন ও শরীয়তের ভাষায় 'তাক্ওয়া' বলা হয়—তাহলে সে এর বিনিময়ে তিনটি প্রতিদান লাভ করে। (১) ফোরকান, (২) পাপের প্রায়শ্চিত্ত (৩) মাগফেরাত বা পরিত্রাণ।

فرق ও فرقان দু'টি ধাতুর সমার্থক। পরিভাষাগতভাবে فرقان (ফোরকান) এমন সব বস্তু বা বিষয়কে বলা হয় যা দু'টি বস্তুর মাঝে প্রকৃত পার্থক্য ও দূরত্ব সূচিত করে দেয়। সেজন্যই কোন বিষয়ের মীমাংসাকে ফোরকান বলা হয়। কারণ, উহা হক ও না-হকের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়। তাছাড়া আল্লাহ্ তাআলার সাহায্যকেও ফোরকান বলা হয়। কারণ, এর দ্বারাও সত্যপন্থীদের বিজয় এবং তাদের প্রতিপক্ষের পরাজয় সূচিত হওয়ার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। সে জন্যই কোরআনে করীমে গযওয়ায়ে-বদরকে 'ইয়াওমুল-ফোরকান' তথা পার্থক্যসূচক দিন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এ আয়াতে বর্ণিত 'তাকওয়া' অবলম্বনকারীদের প্রতি 'ফোরকান' দান করা হবে—কথাটির মর্ম অধিকাংশ মুফাসসেরীনের মতে এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য-সহায়তা থাকে এবং তিনি তাদের হেফাযত করেন। কোন শত্রু তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। যাবতীয় উদ্দেশ্যে তারা সাফল্য লাভে সমর্থ হন।

তফসীরে-মুহায়েমী গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, পূর্ববর্তী ঘটনায় হযরত আবু লুবাব (রাঃ) কর্তৃক স্বীয় পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে যে পদস্খলন ঘটে গিয়েছিল, তা এ কারণেও একটি ত্রুটি ছিল যে, পরিবার-পরিজনের হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি যথাযথ আনুগত্য অবলম্বন করাই ছিল সঠিক পন্থা। তা হলেই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সবই আল্লাহ্ তাআলার হেফাযতে চলে আসত। কোন কোন মুফাসীসের বলেছেন যে, এ আয়াতে ফোরকান বলতে সেসব জ্ঞান-বুদ্ধিকে উদ্দেশ করা হয়েছে যার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা ও খাঁটি মেকীর মাঝে পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায়। অতএব, মর্ম দাঁড়ায়

এই যে, যারা 'তাকওয়া' অবলম্বন করেন, আল্লাহ্ তাদেরকে এমন জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেন যাতে তাদের পক্ষে ভাল-মন্দের পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ তাকওয়ার বিনিময়ে যা লাভ হয়, তাহ্‌ল পাপের মোচন। অর্থাৎ, পার্থিবজীবনে মানুষের দ্বারা যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যায় দুনিয়াতে সেগুলোর কাফ্‌ফারা ও বদলার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। অর্থাৎ, এমন সৎকর্ম সম্পাদনের তৌফীক তার হয়, যা তার সমুদয় ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর প্রবল হয়ে পড়ে। তাকওয়ার প্রতিদানে তৃতীয় যে জিনিষটি লাভ হয়, তাহ্‌ল আখেরাতের মুক্তি ও যাবতীয় পাপের ক্ষমা লাভ।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে— وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা বড়ই অনুগ্রহশীল ও করুণাময়। এতে ইঙ্গিত করে দেয়া হয়েছে যে, আমলের যে প্রতিদান তা তো আমলের পরিমাণ অনুযায়ীই হয়ে থাকে। এখানেও তাকওয়ার প্রতিদানে যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তা তারই বদলা বা প্রতিদান। কিন্তু আল্লাহ্ হচ্ছেন বিরাট অনুগ্রহ ও এহসানের অধিকারী। তাঁর দান ও দয়া কোন পরিমাপের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয় এবং তাঁর দান ও এহসানের অনুমান করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য তিনটি নির্ধারিত প্রতিদান ছাড়াও আল্লাহ্ তাআলার নিকট থেকে আরও বহু দান ও অনুগ্রহ লাভের আশা রাখা কর্তব্য।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ এক অনুগ্রহ ও দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা রসূলে মকবুল (সাঃ), সাহাবোয়ে কেরাম তথা সমগ্র বিশ্বের উপরই হয়েছে। তাহ্‌ল এই যে, হিজরত-পূর্বকালে মহানবী (সাঃ) যখন কাফের পরিবেষ্ঠিত ছিলেন এবং তারা তাঁকে হত্যা কিংবা বন্দী করার ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করছিল, তখন আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাদের এ অপবিত্র হীনচক্রান্তকে ধূলিস্মাৎ করে দেন এবং মহানবী (সাঃ)-কে নিরাপদে মদীনায় পৌছে দেন।

তফসীরে ইবনে-কাসীর ও মাযহারীতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ইমাম আহমদ ও ইবনে জরীর (রহঃ) প্রমুখের রেওয়ায়েতক্রমে এই ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মদীনা থেকে আগত আনসারদের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি যখন মক্কায় জানাজানি হয়ে যায়, তখন মক্কার কোরাইশরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে যে, এ পর্যন্ত তো তাঁর ব্যাপারটি মক্কার ভেতরেই সীমিত ছিল, যেখানে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই ছিল আমাদের হাতে। কিন্তু এখন যখন মদীনাতেও ইসলাম বিস্তার লাভ করছে এবং বহু সাহাবী হিজরত করে মদীনায় চলে গেছেন, তখন এঁদের একটি কেন্দ্র মদীনাতেও স্থাপিত হয়েছে। এমতাবস্থায় এঁরা যে কোন রকম শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের উপর আক্রমণও করে বসতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ কথাও উপলব্ধি করতে পারে যে, এ পর্যন্ত সামান্য কিছু সাহাবীই হিজরত করে মদীনায় গিয়েছেন, কিন্তু এখন প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, স্বয়ং মুহাম্মদ (সাঃ) ও সেখানে চলে যেতে পারেন। সে কারণেই মক্কার নেতৃবর্গ এ বিষয়ে সলা-পরামর্শ করার উদ্দেশে ' দারুন-নদ্‌ওয়াতে' এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করে। 'দারুন-নদওয়া' ছিল মসজিদে-হারাম সংলগ্ন কোসাই ইবনে কেলাবের বাড়ী। বিশেষ জটিল বিষয় ও সমস্যাদির ব্যাপারে সলা-পরামর্শ ও বৈঠকের জন্য তারা এ বাড়ীটিকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। অবশ্য ইসলামী আমলে এটিকে মসজিদে-হারামের অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া হয়। কথিত আছে যে, বর্তমান 'বাবুয-যিয়াদাতই' সে স্থান যাকে তৎকালে দারুন-নদওয়া বলা হতো।

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের জন্য কোরাইশ নেতৃবর্গ দারুন-নদওয়াতেই সমবেত হয়েছিলেন যাতে আবু-জাহ্‌ল, নযর ইবনে হারেস, উমাইয়া ইবনে-খালফ, আবু সুফিয়ান প্রমুখসহ সমস্ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তির মোকাবেলার উপায় ও ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হয়। এখানে বসেই মহানবী (সাঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়।

কিন্তু নবী-রসূলগণের গায়বী শক্তি সম্পর্কে এই মূর্খের দল কেমন করে জানবে। সেদিকে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাদের পরামর্শ কক্ষের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে রসূল করীম (সাঃ)-কে অবহিত করে এই ব্যবস্থা বাতলে দেন যে, আজকের রাতে আপনি নিজের বিছানায় শয়ন করবেন না। আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে মক্কা থেকে হিজরত করারও অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে পরামর্শ অনুযায়ী কোরাইশী নওজোয়ানরা সন্ধ্যা থেকেই সরওয়ারে দু'আলম (সাঃ) - এর বাড়ীটি অবরোধ করে ফেলে। রসূলে করীম (সাঃ) বিষয়টি লক্ষ্য করে হযরত আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন যে, আজ রাতে তিনি মহানবীর বিছানায় রাত্রি যাপন করবেন এবং সাথে সাথে এই সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন যে, এতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রাণের ভয় থাকলেও শত্রুরা কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।

হযরত আলী (রাঃ) একাজের জন্য নিজেকে পেশ করলেন এবং মহানবীর (সাঃ)-এর বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল যে, হুযুর (সাঃ) এই অবরোধ ভেদ করে বেরোবেন কেমন করে ! বস্তুতঃ স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা এক মু'জেযার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করে দেন। তাহ্‌ল এই যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে মহানবী (সাঃ) একমুঠো মাটি হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং অবরোধকারীরা তাঁর ব্যাপারে যে আলাপ-আলোচনা করছিল, তার উত্তর দান করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাদের দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তিকে তাঁর দিক থেকে ফিরিয়ে অন্যদিকে নিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে কেউই তাঁকে দেখতে পায়নি ; অথচ তিনি সবার মাথায় মাটি দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। তাঁর চলে যাবার পর কোন এক আগন্তুক এসে অবরোধকারীদের কাছে জিজ্ঞেস করল, তোমরা এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছ? তারা জানাল, মুহাম্মদ (সাঃ)- এর অপেক্ষায়। আগন্তুক বলল, কোন স্বপ্নে পড়ে রয়েছ; তিনি এখান থেকে বেরিয়ে চলেও গিয়েছেন এবং যাবার সময় তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় মাটি দিয়ে গিয়েছেন ! তখন তারা সবাই নিজেদের মাথায় হাত দিয়ে বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণ পেল।

হযরত আলী (রাঃ) মহানবী (সাঃ)- এর বিছানায় শুয়েছিলেন। কিন্তু অবরোধকারীরা তাঁর পাশ ফেরার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারল, তিনি মুহাম্মদ (সাঃ) নন। কাজেই তাঁকে তারা হত্যা করতে উদ্যোগী হলো না। ভোর পর্যন্ত অবরোধ করে রাখার পর এরা লজ্জিত-অপদস্থ হয়ে ফিরে গেল। এই রাত এবং এতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্য নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন করার বিষয়টি হযরত আলী (রাঃ)- এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।

কোরাইশী সর্দারদের পরামর্শে মহানবী (সাঃ)-এর সম্পর্কে যে তিনটি মত উপস্থাপিত হয়েছিল সে সবকটিই কোরআনের এ আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে — وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ অর্থাৎ, সে সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন কাফেররা আপনার

বিরুদ্ধে নানা রকম ব্যবস্থা নেয়ার বিষয় চিন্তা-ভাবনা করছিল যে, আপনাকে বন্দী করে রাখবে না হত্যা করবে, নাকি দেশ থেকে বের করে দেবে।

কিন্তু আল্লাহ্ তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছেন। সুতরাং আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থাপক, যা যাবতীয় ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে ছাপিয়ে যায়। যেমনটি এ ঘটনার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে।

আরবী অভিধানে مكر শব্দের অর্থ হল কোন ছল-কৌশলের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের লোককে তার উদ্দেশ্য সাধনে বিরত রাখা। বস্তুতঃ একাজ যদি কোন সদুদ্দেশে করা হয় তবে তা উত্তম ও প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু অসৎ মতলবে করা হলে দূষণীয় এবং মন্দকাজ। কাজেই এ শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে এবং আল্লাহ্ তাআলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অবশ্য আল্লাহ্ তাআলার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এমনসব পরিবেশ ও পরিস্থিতিতেই এ শব্দের ব্যবহার হতে পারে যেখানে বাক্যের ধারাবাহিকতা কিংবা তুলনার মাধ্যমে দূষণীয় ছলনার কোন অবকাশ থাকতে না পারে। যেমনটি এখানে হয়েছে।—(মাযহারী)

এখানে এ কথাটিও প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতের শেষাংশে যেসব শব্দ বলা হয়েছে তা বর্তমান -ভবিষ্যতকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ অর্থাৎ, তারা ঈমানদারদেরকে কষ্টদানের জন্য কলা-কৌশল করতে থাকবে এবং আল্লাহ্ তাদের সে কলা-কৌশলকে ব্যর্থ করে দেয়ার ব্যবস্থা নিতে থাকবেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা তদবীর করাটা কাফেরদের চিরাচরিত বৃত্তি থাকবে। আর তেমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য-সহায়তাও সর্বকালেই সত্যিকার মুসলমানদের উপর থেকে তাদের সেসব ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করে দিতে থাকবে।

একত্রিশ ও বত্রিশতম আয়াতে সেই 'দারুন-নদওয়ার' জনৈক সদস্য নযর ইবনে হারেসের এক অহেতুক সংলাপ এবং ত্রিশতম আয়াতে তার জওয়াব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নযর ইবনে হারেস ব্যবসায়ী লোক ছিল এবং বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের ফলে ইহুদী-নাসারাদের গ্রন্থ ও তাদের এবাদত-উপাসনা বার বার দেখার সুযোগ পেয়েছিল। কাজেই সে যখন কোরআনে করীমে বিগত উম্মতসমূহের অবস্থা সংক্রান্ত বিবরণ শুনল তখন বলল— قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ, "এসব তো আমাদের শোনা কথাই। আমরা ইচ্ছা করলে এমন কথা বলতে পারি। এগুলো তো বিগত লোকদেরই ইতিকথা"। তারপর কোন কোন সাহাবী যখন তাকে লা-জওয়াব করে দিলেন যে, যদি বলতেই পার, তবে বলছ না কেন? কোরআন যে সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য বিধান করে দিয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বকে চ্যালেঞ্জও করে দিয়েছে যে, এর বিরোধীরা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে কোরআনের ছোট একটি সূরার অনুরূপই একটি সূরা উপস্থাপন করে দেখাক। অথচ বিরোধিতায় যারা জানের বাজি লাগিয়েছিল, যারা ধন-দৌলত আর সন্তান-সন্তুতিকে পর্যন্ত কোরবান করেছিল তাদের সবাই মিলে কোরআনের মোকাবেলায় ছোট একটি সূরাও পেশ করতে পারেনি। তাহলে একথা বলা যে, আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে আমরাও এমন কালাম বলতে পারি,—এমন একটি কথা যা লাজ-লজ্জার অধিকারী কোন লোকই বলতে পারে না। তারপর নযর ইবনে হারেসের সামনে সাহাবায়ে কেরাম এই কালামের সত্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করলেন, তখন সে স্বীয় ভ্রান্ত মতবাদের উপর তার দৃঢ়তা প্রকাশ করার উদ্দেশে বলতে লাগল ঃ اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, এই কোরআনই যদি আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়ে থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন কিংবা কোন কঠিন আযাব নাযিল করে দিন।

স্বয়ং কোরআন করীম এর উত্তর দিয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ (সাঃ), আপনার মক্কায় থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব করবেন না। কারণ, সমস্ত নবী-রসূলগণের ব্যাপারেই আল্লাহ্র নীতি এই যে, তাঁরা যে জনপদে থাকেন তাতে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন আযাব নাযিল করেন না, যতক্ষণ না স্বীয় পয়গম্বরগণকে সেখান থেকে সরিয়ে নেন।

এ উত্তরের সারমর্ম এই যে, তোমরা তো কোরআন ও ইসলামের বিরোধিতার কারণে পাথর বর্ষণেরই যোগ্য, কিন্তু মহানবী (সাঃ)-এর মক্কায় অবস্থান এর অন্তরায়। ইমাম ইবনে জরীর (রহঃ) বলেন, আয়াতের এ অংশটি সে সময় নাযিল হয়েছিল যখন হুযুর (সাঃ) মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তারপর মদীনায় হিজরত করার পর আয়াতের দ্বিতীয় অংশ অবতীর্ণ হয়। وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না, তখন তারা এস্তেগফার তথা ক্ষমাপ্রার্থনা করে। এর মর্ম এই যে, মহানবী (সাঃ)-এর মদীনা চলে যাবার পর যদিও ব্যাপক আযাবের পথে যে অন্তরায় ছিল তা দূর হয়ে গেছে, অর্থাৎ, তাঁর সেখানে বর্তমান থাকা, কিন্তু তারপরেও আযাব আসার পথে আরেকটি বাধা রয়ে গেছে তাহল এই যে, অনেক দুর্বল মুসলমান যারা হিজরত করতে পারছিলেন না, সেখানে রয়ে গিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্র দরবারে এস্তেগফার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন। তাঁদেরই খাতিরে মক্কাবাসীদের উপর আযাব নাযিল করা হয়নি।

অতঃপর এ সমস্ত মুসলমানও হিজরত করে যখন মদীনায় পৌঁছে যান, তারপরে আয়াতের এই বাক্যটি নাযিল হয় ঃ وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাদেরকে আযাব দেবেন না তা কেমন করে হয়, অর্থাৎ, তারা রসূলকে মসজিদে-হারামে গিয়ে এবাদত করতে বাধা দান করে।

অর্থাৎ, আযাব আসার পথের দু'টি অন্তরায়ই এখন দূর হয়ে গেছে। এখন মক্কাতে না আছেন মহানবী (সাঃ), না আছেন ক্ষমা প্রার্থনাকারী মুসলমানগণ। অতএব, আযাব আসতে এখন আর কোন বাধাই অবশিষ্ট নেই। বিশেষতঃ তাদের শাস্তিযোগ্য অপরাধের মধ্যে ইসলাম বিরোধিতা ছাড়াও আরেকটি অপরাধ সংযোজিত হয়েছে যে, তারা নিজেরা তো এবাদত -উপাসনার যোগ্য ছিলই না, তদুপরি যেসব মুসলমান এবাদত, ওমরা ও তওয়াফের উদ্দেশে মসজিদে-হারামে আসতে চায় তাদেরকেও বাধাদান করতে শুরু করেছে। অতএব, এখন তাদের শাস্তিপ্রাপ্তির বিষয়টি পরিপূর্ণ হয়ে গেছে; সুতরাং মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাদের উপর সে আযাবই নাযিল করা হয়।

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۴﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ
عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ؕ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۳۵﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ
اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ
تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ۬ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا
اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ﴿۳۶﴾ لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ
يَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا
فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۳۷﴾ قُلْ لِّلَّذِيْنَ
كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا
فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۳۸﴾ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا
تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۳۹﴾ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا
اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ؕ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿۴۰﴾

(৩৪) আর তাদের মধ্যে এমন কি বিষয় রয়েছে, যার ফলে আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব দান করবেন না ! অথচ তারা মসজিদে-হারামে যেতে বাধাদান করে, অথচ তাদের সে অধিকার নেই। এর অধিকার তো তাদেরই রয়েছে যারা পরহেযগার। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে বিষয়ে অবহিত নয়। (৩৫) আর কা'বার নিকট তাদের নামায বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজানো ছাড়া অন্য কোন কিছুই ছিল না। অতএব, এবার নিজেদের কৃত কুফরীর আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর। (৩৬) নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফের, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে করে বাধাদান করতে পারে আল্লাহ্র পথে। বস্তুতঃ এখন তারা আরো ব্যয় করবে। তারপর তাই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষপর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা কাফের, তাদেরকে দোযখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (৩৭) যাতে পৃথক করে দেন আল্লাহ্ অপবিত্র ও না-পাককে পবিত্র ও পাক থেকে। আর যাতে একটির পর একটিকে স্থাপন করে সমবেত স্তূপে পরিণত করেন এবং পরে দোযখে নিক্ষেপ করেন। এরাই হল ক্ষতিগ্রস্ত। (৩৮) তুমি বলে দাও, কাফেরদেরকে যে, তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তবে যা কিছু ঘটে গেছে ক্ষমা হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আবারও যদি তাই করে, তবে পূর্ববর্তীদের পথ নির্ধারিত হয়ে গেছে। (৩৯) আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহ্র সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। (৪০) আর তারা যদি না মানে, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ তোমাদের সমর্থক; এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বলা হয়েছিল যে, মক্কার মুশরিকরা নিজেদের কুফরী ও অস্বীকৃতির দরুন যদিও আসমানী আযাব প্রাপ্তিরই যোগ্য, কিন্তু মক্কায় রসূলে করীম (সাঃ) – এর উপস্থিতি ব্যাপক আযাবের পথে অন্তরায় হয়ে আছে। আর তাঁর হিজরতের পর সে সমস্ত অসহায়-দুর্বল মুসলমানদের কারণে এমন আযাব আসছে না যারা মক্কায় থেকে আল্লাহ্ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে বলা হচ্ছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) কিংবা অসহায় ও দুর্বল মুসলমানদের কারণে যদি দুনিয়াতে তাদের আযাব রহিত হয়েও গিয়ে থাকে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, এরা আযাবের যোগ্যই নয়। বরং তাদের আযাবের যোগ্য হওয়াটা পরিষ্কার। তাছাড়া কুফরী ও অস্বীকৃতি ছাড়াও তাদের এমনসব অপরাধ রয়েছে যার ফলে তাদের উপর আযাব নেমে আসা উচিত। আলোচ্য আয়াত দু'টিতে তাদের তিনটি অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমতঃ এরা নিজেরা তো মসজিদে-হারাম অর্থাৎ, খানায়ে-কা'বায় এবাদত করার যোগ্য নয়, তদুপরি যেসব মুসলমান সেখানে এবাদত-বন্দেগী ও নামায, তওয়াফ প্রভৃতি আদায় করতে চায়, তাদেরকে বাধাদান করে। এতে হোদায়বিয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ হিজরী সালে যখন রসূলে করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামসহ ওমরা পালনের উদ্দেশে মক্কায় আগমন করেন, তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁকে বাধাদান করেছিল এবং ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল।

দ্বিতীয় অপরাধ হল এই যে, এই নির্বোধের দল মনে করত এবং বলত যে, আমরা মসজিদে-হারামের মোতাওয়াল্লী, যাকে ইচ্ছা এখানে আসতে অনুমতি দেব, যাকে ইচ্ছা দেব না।

তাদের এই ধারণা ছিল দু'টি ভুল বুঝাবুঝির ফলশ্রুতি। প্রথমতঃ এই যে, তারা নিজেদেরকে মসজিদে-হারামের মোতাওয়াল্লী বলে মনে করেছিল, অথচ কোন কাফের কোন মসজিদের মোতাওয়াল্লী হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তাদের এই ধারণা যে, যাকে ইচ্ছা তারা মসজিদে আসতে বাধাদান করতে পারে। অথচ মসজিদ যেহেতু আল্লাহ্র ঘর, সুতরাং এতে আসতে বাধা দেবার অধিকার কারো নেই। তবে এমন বিশেষ অবস্থার কথা স্বতন্ত্র, যাতে মসজিদের অবমাননা কিংবা অন্যান্য নামাযীদের কষ্টের আশঙ্কা থাকে। যেমন, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন— "নিজেদের মসজিদসমূহকে রক্ষা কর ছোট শিশুদের থেকে, পাগলদের থেকে এবং নিজেদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ থেকে।" ছোট শিশু বলতে সেসব শিশুকে উদ্দেশ করা হয়েছে যাদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর পাগলদের দ্বারা অপবিত্রতারও আশঙ্কা থাকে এবং নামাযীদের কষ্টেরও সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া নিজেদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের দরুন মসজিদের অসম্মানও হয় এবং নামাযীদের কষ্টও হয়।

এ হাদীসের ভিত্তিতে মসজিদের একজন মোতাওয়াল্লীর এমন শিশু ও পাগলদেরকে মসজিদে আসতে না দেয়ার এবং মসজিদে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ হতে না দেয়ার অধিকার থাকলেও এমন অবস্থা বা পরিস্থিতি ব্যতীত কোন মুসলমানকে মসজিদে আসতে বাধা দেয়ার কোন অধিকার নেই।

কোরআন করীমে আলোচ্য আয়াতটিতে শুধু প্রথম বিষয়টিরই

আলোচনা করা হয়েছে যে, মসজিদে-হারামের মোতাওয়াল্লী যখন শুধুমাত্র মুত্তাকী-পরহেযগার ব্যক্তিই হতে পারেন, তখন তাদেরকে কেমন করে এর মোতাওয়াল্লী হিসাবে স্বীকার করা যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদের মোতওয়াল্লী কোন মুসলমান দ্বীনদার ও পরহেযগার ব্যক্তিরই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন কোন মুফাসসেরীন إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ এর সর্বনামটি আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত বলে সাব্যস্ত করে এই অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ্‌র ওলী শুধুমাত্র মুত্তাকী-পরহেযগার ব্যক্তিরাই হতে পারেন।

এই তফসীর বা ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের মর্ম এই দাঁড়ায় যে, যারা শরীয়ত ও সুন্নতের বরখেলাফ আমল করা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র ওলী হওয়ার দাবী করে, তারা সর্বৈব মিথ্যাবাদী এবং যারা এহেন লোকদের ওলীআল্লাহ্ বলে মনে করে, তারা (একান্তভাবেই) ধোঁকায় পতিত।

তাদের তৃতীয় অপরাধ এই যে, তাদের মধ্যে কুফর ও শেরেকের পঙ্কিলতা তো ছিলই, তাদের কার্যকলাপও সাধারণ মানবিকতার স্তর থেকেও বহু নিম্নে রয়েছে। কারণ, এরা নিজেদের যে কাজকে 'নামায' নামে অভিহিত করে, তা মুখে কিছু শিস দেয়া এবং হাতে কিছু তালি বাজানো ছাড়া আর কিছু নয়। বলাবাহুল্য, যার সামন্যতম বুদ্ধিও থাকবে সেও এধরনের কার্যকলাপকে এবাদত কিংবা নামায তো দূরের কথা, সঠিক কোন মানবীয় আচরণও বলতে পারে না। কাজেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ অর্থাৎ, তোমাদের কুফরী ও অপরাধের পরিণতি এই যে, এবার আল্লাহ্‌র আযাবের আস্বাদ গ্রহণ কর। আযাব বলতে এখানে আখেরাতের আযাব হতে পারে এবং পার্থিব আযাবও হতে পারে যা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের মাধ্যমে তাদের উপর নাযিল হয়।

এ ঘটনার বিবরণ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত রয়েছে যে, গযওয়ায়ে-বদরের পরাজয়ের পর অবশিষ্ট আহত মক্কাবাসী কাফেররা যখন মক্কায় গিয়ে পৌছল, তখন যাদের পিতা-পুত্র এযুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তারা বাণিজ্যিক কাফেলার আমীর আবু সুফিয়ানের কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে যে, আপনি তো জানেন, এ যুদ্ধটি বাণিজ্যিক কাফেলার হেফাযতকল্পে করা হয়েছে, যার ফলে জান-মালের এহেন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই আমরা চাই, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে আমাদের কিছু সাহায্য করা হোক, যাতে আমরা ভবিষ্যতে মুসলমানদের থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি। তারা এ দাবী মেনে নিয়ে তাদেরকে এক বিরাট অঙ্কের অর্থ দিয়ে দেয় যা তারা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ওহুদ যুদ্ধে ব্যয় করে এবং তাতেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ফলে পরাজয়ের গ্লানির সাথে সাথে অর্থ অপচয়ের অতিরিক্ত অনুতাপ যোগ হয়ে যায়।

কোরআন করীম এ আয়াতে এই ঘটনার পূর্বেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এর পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে দেয়। বলা হয়, যারা কাফের, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে মানুষকে বাধাদান করার কাজে ব্যয় করতে চাইছে। অতএব, তার পরিণতি হবে এই যে, নিজেদের ধন-সম্পদও ব্যয় করে বসবে এবং পরে এ ব্যয়ের জন্য তাদের অনুতাপ হবে। অথচ শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পরাজয়ই বরণ করতে হবে। বস্তুতঃ গযওয়ায়ে-ওহুদে ঠিক তাই ঘটেছে; সঞ্চিত ধন-সম্পদও ব্যয় করে ফেলেছে এবং পরে যখন পরাজিত হয়েছে, তখন পরাজয়ের গ্লানির সাথে সাথে ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার জন্য অতিরিক্ত অনুতাপ ও দুঃখ পোহাতে হয়েছে।

বগভী প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতের বিষয়বস্তুকে বদর যুদ্ধের ব্যয়সংক্রান্ত বলেই অভিহিত করেছেন। বদর যুদ্ধে এক হাজার জোওয়ানের বাহিনী মুসলমানদের মোকাবেলা করতে গিয়েছিল। তাদের খাবার-দাবার এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যয়ভার মক্কার বার জন সর্দার নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল আবু-জাহ্‌ল, ওৎবা, শায়বা প্রমুখ। বলাবাহুল্য, এক হাজার লোকের যাতায়াত ও খানা-পিনা প্রভৃতিতে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় হয়েছিল। কাজেই নিজেদের পরাজয়ের সাথে সাথে অর্থ ব্যয়ের জন্যও বিপুল অনুতাপ ও আফসোস হয়েছিল—(মাযহারী)

আয়াত শেষে আখেরাতের দিক দিয়ে তাদের মন্দ পরিণতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ অর্থাৎ, যারা কাফের, জাহান্নামের দিকেই হবে তাদের হাশর।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে সত্য দ্বীন থেকে বাধা দানকল্পে অর্থ ব্যয়ের যে অশুভ পরিণতির কথা বলা হয়েছে, তাতে বর্তমান কালের সেসব কাফেরও অর্ন্তভুক্ত যারা মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখতে এবং নিজেদের মিথ্যা ও বাতিল মতবাদের প্রতি আহবান করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাসপাতালে, শিক্ষাঙ্গনে এবং দান-খয়রাতের নামে ব্যয় করে থাকে। তেমনিভাবে সেসব পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরাও এর অন্তর্ভুক্ত, যারা ইসলামের সর্ববাদীসম্মত আকীদা ও বিশ্বাসসমূহে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি ও সেগুলোর বিরুদ্ধে মানুষকে আহবান করার উদ্দেশে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং তাঁর দ্বীনের হেফাযত করেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখাও যায় যে, এরা বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ ব্যয় করা সত্ত্বেও নিজেদের উদ্দেশে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য থেকে যায়।

৩৭তম আয়াতে উল্লেখিত ঘটনাবলীর কিছু ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে যার সার-সংক্ষেপ এই যে, কাফেররা যেসব সম্পদ ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে এবং পরে যার জন্য দুঃখ ও অনুতাপ করেছে আর অপমানিত-অপদস্থ হয়েছে, তাতে ফায়দা হয়েছে এই لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যাতে অপবিত্র পঙ্কিল এবং পবিত্র পূতঃ বস্তুতে পার্থক্য প্রকাশ করে দেন। طيب ও خبيث দু'টি বিপরীতার্থক শব্দ। خبيث শব্দটি অপবিত্র, পঙ্কিল ও হারাম বস্তুকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আর طيب তার বিপরীতে পবিত্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তুকে বোঝাতে বলা হয়। এখানে এ দু'টি শব্দের দ্বারা যথাক্রমে কাফেরদের অপবিত্র ধন-সম্পদ এবং মুসলমানদের পবিত্র সম্পদ ও অর্থ বোঝা যেতে পারে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে এই যে, কাফেররা বিপুল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছে তা ছিল অপবিত্র ও হারাম সম্পদ। ফলে তার অশুভ পরিণতি দাঁড়িয়েছে এই যে, তাতে মালও গেছে এবং জানও গেছে। পক্ষান্তরে তার বিপরীতে মুসলমানরা অতি অল্প পরিমাণ সম্প ব্যয় করেছে, কিন্তু সে সম্পদ ছিল পবিত্র ও হালাল। ফলে তা ব্যয়কারীরা বিজয় অর্জন করেছেন এবং সাথে সাথে গনীমতের মালামাল অর্জনেও সমর্থ হয়েছেন। তারপর এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي
جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা এক 'খবীস' তথা অপবিত্রকে অপর অপবিত্রের সাথে মিলিয়ে দেন এবং তারপর সে সমস্তকে সমবেত কর

দেবেন জাহান্নামে। বস্তুতঃ এরাই হল ক্ষতির সম্মুখীন।

অর্থাৎ, পৃথিবীতে যেমন চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, এবং আধুনিক বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাই পারস্পরিক আকর্ষণের উপর স্থাপিত, তেমনিভাবে কাজ–কর্ম, আচার–আচরণ ও স্বভাব–চরিত্রের মধ্যেও একটা আকর্ষণ রয়েছে। একটি মন্দ কাজ অন্যান্য মন্দ কাজকে এবং একটি ভাল কাজ অন্যান্য ভাল কাজকে আকর্ষণ করে। একটি খারাপ সম্পদ আরেকটি খারাপ সম্পদকে টেনে আনে এবং তারপর এসব খারাপ সম্পদ মিলে অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আর এরই পরিণতি হিসাবে আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত অপবিত্র সম্পদরাজিকে জাহান্নামে সমবেত করবেন এবং এসব সম্পদের অধিকারীরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

এছাড়া এখানে অনেক তফসীরবিদ মনীষী خبيث ও طيب এর সাধারণ অর্থ যথাক্রমে অপবিত্র ও পবিত্র বলেই সাব্যস্ত করেছেন এবং 'পাক' বলতে মুমিন আর অপবিত্র বলতে কাফের বুঝিয়েছেন। এমতাবস্থায় মর্ম হবে এই যে, উল্লেখিত অবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র ও অপবিত্র অর্থাৎ, মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য করতে চান; সমস্ত মুমিন জান্নাতে আর সমস্ত কাফের জাহান্নামে সমবেত হোক, এটাই তাঁর ইচ্ছা।

৩৮তম আয়াতে কাফেরদের প্রতি আবারো এক মুরুব্বীসুলভ আহবান জানানো হয়েছে। এতে উৎসাহও রয়েছে এবং ভীতিও রয়েছে। উৎসাহ এ ব্যাপারে যে, যদি তারা এ সমুদয় কুকর্মের পরে এখনও তওবা করে নেয় এবং ঈমান নিয়ে আসে, তাহলে পূর্বকৃত সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর ভীতি হলো এই যে, তারা যদি এখনো অপকর্ম থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলাকে নতুন কোন আইন প্রণয়ন কিংবা নতুন করে কোন চিন্তাভাবনা করতে হবে না। বিগত কালের কাফেরদের জন্য যে আইন প্রবর্তিত হয়ে গেছে তাই তাদের উপরও প্রবর্তন করা হবে। অর্থাৎ,পৃথিবীতে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে এবং আখেরাতে হয়েছে কঠিন আযাবের যোগ্য !

এটি হলো সুরা আনফালের উনচল্লিশতম আয়াত। এতে দু'টি শব্দ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

(১) ফেৎনা (২) দ্বীন। আরবী অভিধান অনুযায়ী শব্দ দু'টি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তফসীরশাস্ত্রের ইমামগণ সাহাবায়ে–কেরাম ও তাবেঈনদের নিকট থেকে এখানে দু'টি অর্থ উদ্ধৃত করেছেন। (১) ফেৎনা অর্থ কুফর ও শিরক আর (২) দ্বীন অর্থ ইসলাম। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এই বিশ্লেষণই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এই তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মুসলমানদিগকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে হবে যতক্ষণ না কুফর নিঃশেষিত হয়ে ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে এই নির্দেশ শুধুমাত্র মক্কাবাসী এবং আরববাসীদের জন্যে নির্দিষ্ট হবে। কারণ,আরব হচ্ছে ইসলামের উৎসস্থল। এতে ইসলাম ছাড়া যদি অন্য কোন ধর্ম বিদ্যমান থাকে তাহলে দ্বীনে–ইসলামের জন্য তা হবে আশংকাজনক। তবে পৃথিবীর অন্যত্র অন্যান্য ধর্মমত ও আদর্শকে আশ্রয় দেয়া যেতে পারে। যেমন, কোরআন করীমের অন্যান্য আয়াতে এবং হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে।

আর দ্বিতীয় তফসীর যা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত রয়েছে তাহল এই যে, এতে 'ফেৎনা' অর্থ হচ্ছে সেসব দুঃখ–দুর্দশা ও বিপদাপদের ধারা, যা মক্কার কাফেররা সদাসর্বদা মুসলমানদের উপর অব্যাহত রেখেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মক্কায় অবস্থান করছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তাদের অবরোধে আবদ্ধ থেকে নানা রকম কষ্ট সহ্য করে গেছেন। তারপর যখন তারা মদীনায় হিজরত করেন, তখন তারা মুসলমানের পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁদের হত্যা ও লুন্ঠন করতে থাকে। এমনকি মদীনায় পৌঁছার পরও গোটা মদীনা আক্রমণের মাধ্যমে তাদের হিংসা–রোষই প্রকাশ পেতে থাকে।

পক্ষান্তরে 'দ্বীন' শব্দের অর্থ হল প্রভাব ও বিজয়। এ ক্ষেত্রে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এই যে, মুসলমানগণকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকা কর্তব্য, যতক্ষণ না তাঁরা অন্যের অত্যাচার–উৎপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)–এর এক ঘটনার দ্বারাও এ ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়। তাহল এই যে, মক্কার প্রশাসক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)–এর বিরুদ্ধে যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সৈন্য সমাবেশ করে এবং উভয়পক্ষে মুসলমানদের উপরই যখন মুসলমানদের তলোয়ার চলতে থাকে, তখন দু'জন লোক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) – এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, এইক্ষণে মুসলমানগণ যে মহাবিপদের সম্মুখীন, তা আপনি নিজেই দেখছেন। অথচ আপনি সেই ওমর ইবনে খাত্তাবের পুত্র, যিনি কোনক্রমেই এহেন ফেৎনা–ফাসাদকে বরদাশত করতেন না। কাজেই আপনি আজকের ফেৎনার সমাধান করার উদ্দেশে কি কারণে এগিয়ে আসেন না ? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা কোন মুসলমানের রক্তপাত করাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আগত দু'জন আরয করলেন, আপনি কি কোরআনের এ আয়াতটি পাঠ করেন না وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ অর্থাৎ, যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফেৎনা–ফাসাদ তথা দাঙ্গা–হাঙ্গামা থাকে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আমি এ আয়াত পাঠ করি এবং এর উপর আমলও করি। আমরা এ আয়াতের ভিত্তিতে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছি যতক্ষণ না ফেৎনা শেষ হয়ে দ্বীন–ইসলামের বিজয় সূচিত হবে। অথচ তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত সত্যধর্মের বিরুদ্ধে অন্য কারো বিজয় সূচিত হোক, তা চাও না ! তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, জেহাদ ও যুদ্ধের হুকুম ছিল কুফুরীর ফেৎনা এবং কাফেরদের অত্যাচার–উৎপীড়নের বিরুদ্ধে। তা আমরা করেছি এবং বরাবরই করে যাচ্ছি। আর তাতে করে সে ফেৎনা প্রদমিত হয়ে গেছে। মুসলমানদের পারস্পরিক গৃহযুদ্ধকে তার সাথে তুলনা করা যথার্থ নয়। বরং মুসলমানদের পারস্পরিক লড়াই–বিবাদের ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ)– এর হেদায়েত হচ্ছে এই যে, তাতে বসে থাকা লোকটি দাঁড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম।

এ বিশ্লেষণের সারমর্ম এই যে, মুসলমানদের উপর ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ–জেহাদ অব্যাহত রাখা ওয়াজিব, যতক্ষণ না মুসলমানদের উপর তাদের অত্যাচার–উৎপীড়নের ফেৎনার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং যতক্ষণ না তথাকথিত সমস্ত ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় সূচিত হয়। আর এমন অবস্থাটি কেয়ামতের নিকটবর্তী কালেই বাস্তবায়িত হবে এবং সে কারণে কেয়ামত পর্যন্তই জেহাদের হুকুম অব্যাহত ও বলবৎ থাকবে।

ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ–জেহাদের পরিণতিতে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমতঃ এই যে, তারা মুসলমানদের উপর

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَ
لِلرَّسُوْلِ وَلِذِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰكِیْنِ وَابْنِ
السَّبِیْلِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا یَوْمَ
الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعٰنِ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (٤١)
اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْیَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰی وَ
الرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِی
الْمِیْعٰدِ وَلٰكِنْ لِّیَقْضِیَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا لِّیَهْلِكَ
مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَّیَحْیٰی مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ وَاِنَّ
اللّٰهَ لَسَمِیْعٌ عَلِیْمٌ (٤٢) اِذْ یُرِیْكَهُمُ اللّٰهُ فِیْ مَنَامِكَ قَلِیْلًا
وَلَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِیْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِی الْاَمْرِ
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ اِنَّهٗ عَلِیْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (٤٣) وَ
اِذْ یُرِیْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَیْتُمْ فِیْٓ اَعْیُنِكُمْ قَلِیْلًا وَّیُقَلِّلُكُمْ
فِیْٓ اَعْیُنِهِمْ لِیَقْضِیَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا وَاِلَی اللّٰهِ
تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ (٤٤) یٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِیْتُمْ فِئَةً
فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِیْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (٤٥)

(৪১) আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাবেও, তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহ্‌র জন্য, রসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহ্‌র উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল। (৪২) আর যখন তোমরা ছিলে সমরাঙ্গনের এ প্রান্তে আর তারা ছিল সে প্রান্তে অথচ কাফেলা তোমাদের থেকে নীচে নেমে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় যদি তোমরা পারস্পরিক অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে, তবে তোমরা এক সঙ্গে সে ওয়াদা পালন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক কাজ করতে চেয়েছিলেন, যা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল — যাতে সে সব লোক নিহত হওয়ার ছিল, প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর এবং যাদের বাঁচার ছিল, তারা বেঁচে থাকে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর। আর নিশ্চিতই আল্লাহ্ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ। (৪৩) আল্লাহ্ যখন তোমাকে স্বপ্নে সেসব কাফেরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন ; বেশী করে দেখালে তোমরা কাপুরুষতা অবলম্বন করতে এবং কাজের বেলায় বিপদ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ্ বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তিনি অতি উত্তমভাবেই জানেন; যা কিছু অন্তরে রয়েছে। (৪৪) আর যখন তোমাদেরকে দেখালেন সে সৈন্য দল মোকাবেলার সময় তোমাদের চোখে অল্প এবং তোমাদেরকে দেখালেন তাদের চোখে অল্প, যাতে আল্লাহ্ সে কাজ করে নিতে পারেন যা ছিল নির্ধারিত। আর সব কাজই আল্লাহ্‌র নিকট গিয়ে পৌঁছায়। (৪৫) হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশে কৃতকার্য হতে পার।

অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে বিরত হয়ে যাবে, তা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমেও হতে পারে, কিংবা নিজ নিজ ধর্মমতে থেকেই আনুগত্যের চুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমেও হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ এতদুভয় অবস্থার কোনটি গ্রহণ না করে অব্যাহত মোকাবেলায় স্থির থাকবে। আয়াতে এই উভয় অবস্থার হুকুমই বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا یَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ

অর্থাৎ, তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ্ তাদের কার্যকলাপ যথার্থভাবেই অবলোকন করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে গনীমতের বিধান ও তার বন্টননীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অভিধানে 'গনীমত' বলা হয় সে সমস্ত মাল-সামানকে যা শত্রুর নিকট থেকে লাভ হয়। শরীয়তের পরিভাষা অনুযায়ী অমুসলমানদের নিকট থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহে বিজয়ার্জনের মাধ্যমে যে মালামাল অর্জিত হয়, তাকেই বলা হয় 'গনীমত'। আর যা কিছু আপোষ, সন্ধি-সম্মতির মাধ্যমে অর্জিত হয়, যেমন, জিযিয়া কর, খাজনা-টেক্স প্রভৃতি — তাকে বলা হয় 'ফাই'। কোরআন করীমে এতদুভয় শব্দের মাধ্যমে (অর্থাৎ, 'গনীমত' ও 'ফাই') এতদুভয় প্রকার মালামালের হুকুম-আহ্‌কাম তথা বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা-আনফালে সে গনীমতের মালামালের কথাই আলোচিত হয়েছে যা যুদ্ধকালে অমুসলমানদের কাছ থেকে লাভ হয়েছে।

এখানে সর্বাগ্রে একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ইসলামী ও কোরআনী মতাদর্শ অনুযায়ী সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিকানা শুধুমাত্র সে সত্তার জন্য নির্ধারিত যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের পক্ষে কোন কিছুর মালিকানা লাভ করার একটি মাত্র পন্থা রয়েছে। তা হল এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় আইনের মাধ্যমে কোন বস্তুতে কোন ব্যক্তির মালিকানা সাব্যস্ত করে দেন। যেমন, সূরা ইয়াসীনে চতুষ্পদ জীবের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে — 'এরা কি দেখতে পায় না যে, চতুষ্পদ-জন্তুসমূহকে আমি নিজে সৃষ্টি করেছি (এবং) তারপর তারা সেগুলোর মালিক হয়েছে।' অর্থাৎ, এদের মালিকানা নিজস্ব নয়, বরং আমিই নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে এগুলোর মালিক বানিয়েছি।

কোন জাতি যখন আল্লাহ্ তাআলার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, অর্থাৎ, কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন প্রথম আল্লাহ্ তাআলা তাদের সংশোধনের উদ্দেশে স্বীয় রসূল ও কিতাব পাঠিয়ে থাকেন। যে হতভাগা এ খোদায়ী দানের মাধ্যমেও প্রভাবিত না হয়, তার বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা যে নির্দেশ দিয়েছেন তার মর্ম দাঁড়ায় এই যে, এই বিদ্রোহীদের জান-মাল সবই হালাল করে দেয়া হয়েছে আল্লাহ্ প্রদত্ত মালামালের দ্বারা লাভবান হওয়ার কোন অধিকারই আর তাদেরই নেই। বরং তাদের ধন-সম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হয়েছে। এই বাজেয়াপ্ত করা মালামালেরই অপর নাম, গনীমতের মাল যা কাফেরদের মালিকানা থেকে বেরিয়ে একান্তভাবে আল্লাহ্ তাআলার মালিকানায় রয়ে গেছে।

وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهٗ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ
رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِينَ (٤٦) وَلَا تَكُونُوا
كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَ
يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (٤٧)
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ
الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ
نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّنْكُمْ إِنِّيٓ أَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ
إِنِّيٓ أَخَافُ اللّٰهَ ۗ وَاللّٰهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٤٨) إِذْ يَقُولُ
الْمُنٰفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِينُهُمْ ۗ
وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤٩) وَ
لَوْ تَرٰٓى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ
وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (٥٠) ذٰلِكَ
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (٥١)
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَفَرُوا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٥٢)

(৪৬) আর আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা রয়েছেন দৈর্যশীলদের সাথে (৪৭) আর তাদের মত হয়ে যেয়ো না, যারা বেরিয়েছে নিজেদের অবস্থান থেকে গর্বিতভাবে এবং লোকদেরকে দেখাবার উদ্দেশে। আর আল্লাহ্র পথে তারা বাধা দান করত। বস্তুতঃ আল্লাহ্র আয়ত্বে রয়েছে সে সমস্ত বিষয় যা তারা করে। (৪৮) আর যখন সুদৃশ করে দিল শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে এবং বলল যে, আজকের দিনে কোন মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না আর আমি হলাম তোমাদের সমর্থক, অতঃপর যখন সামনাসামনী হল উভয় বাহিনী তখন সে অতি দ্রুত পায়ে পেছন দিকে পালিয়ে গেল এবং বলল, আমি তোমাদের সাথে নাই—আমি দেখছি, যা তোমরা দেখছ না ; আমি ভয় করি আল্লাহ্কে। আর আল্লাহ্র আযাব অত্যন্ত কঠিন। (৪৯) যখন মোনাফেকরা বলতে লাগল এবং যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত, এরা নিজেদের ধর্মের উপর গর্বিত। বস্তুতঃ যারা ভরসা করে আল্লাহ্র উপর, সে নিশ্চিন্ত, কেননা আল্লাহ্ অতি পরাক্রমশীল, সুবিজ্ঞ। (৫০) আর যদি তুমি দেখ, যখন ফেরেশতারা কাফেরদের জান কবজ করে; প্রহার করে, তাদের মুখে এবং তাদের পশ্চাদদেশে আর বলে, জ্বলন্ত আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর। (৫১) এই হলো সে সবের বিনিময় যা তোমরা তোমাদের পূর্বে পাঠিয়েছ নিজের হাতে। বস্তুতঃ এটি এ জন্য যে, আল্লাহ্ বন্দার উপর যুলুম করেন না। (৫২) যেমন, রীতি রয়েছে ফেরাউনের অনুসারীদের এবং তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের ব্যাপারে যে, এরা আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং সেজন্য আল্লাহ্ তাআলা তাদের পাকড়াও করেছেন তাদেরই পাপের দরুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহা শক্তিশালী, কঠিন শাস্তিদাতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যুদ্ধ-জেহাদে কৃতকার্যতা লাভের জন্য কোরআনের হেদায়েত : প্রথম দুই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানগণকে যুদ্ধক্ষেত্র এবং শত্রুর মোকাবেলার জন্য একটি বিশেষ হেদায়েতনামা দান করেছেন, যা তাদের জন্য পার্থিব জীবনে কৃতকার্যতা এবং পরকালীন নাজাতের অমোঘ ব্যবস্থা। প্রাথমিক যুগের যুদ্ধসমূহে মুসলমানদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের রহস্যও এতেই নিহিত ছিল।

প্রথমত দৃঢ়তা : অর্থাৎ, দৃঢ়তা অবলম্বন করা ও স্থির-অটল থাকা। মনের দৃঢ়তা ও সংকল্পের অটলতা উভয়টি এর অন্তর্ভুক্ত। মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাই জানে, উপলব্ধি করে এবং পৃথিবীর প্রতিটি জাতি নিজেদের যুদ্ধে এরই উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। কারণ, অভিজ্ঞ লোকদের কাছে এ বিষয়টি গোপন নেই যে, সমরক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এবং সব চাইতে কার্যকর অস্ত্রই হচ্ছে মন ও পদক্ষেপের দৃঢ়তা। এর অবর্তমানে অন্যান্য সমস্ত উপায়-উপকরণই অকেজো, বেকার।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্র যিকর : এটি সেই বিশেষ ধরনের আধ্যাত্মিক হাতিয়ার যার ব্যাপারে ঈমানদারগণ ব্যতীত সাধারণ পৃথিবী গাফেল। সমগ্র পৃথিবী যুদ্ধের জন্য সর্বোত্তম অস্ত্রশস্ত্র, আধুনিকতম সাজ-সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য এবং সেনাবাহিনীকে সুদৃঢ় রাখার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা নেয়। কিন্তু মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব এ হাতিয়ার সম্পর্কে তারা অপরিচিত ও অজ্ঞ। সে কারণেই এই হেদায়েত, এই নির্দেশনামা। এই নির্দেশনামা মোতাবেক যে কোন অঙ্গনে যে কোন জাতির সাথে মোকাবেলা হয়েছ, প্রতিপক্ষের সমস্ত শক্তি ও চেষ্টা-তদবীর পুরোপুরি নিষ্ক্রয় হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্র যিকরে নিজস্বভাবে যে বরকত ও কল্যাণ রয়েছে তা তো যথাস্থানে আছেই, তদুপরি এটাও একটি বাস্তব সত্য যে, দৃঢ়তার জন্যও এর চেয়ে পরীক্ষিত কোন ব্যবস্থা নেই। আল্লাহ্কে স্মরণ করা এবং তাতে বিশ্বাস রাখা এমন এক বিদ্যুৎ শক্তি যা একজন দুর্বলতর মানুষকেও পাহাড়ের সাথে মোকাবেলা করতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। বিপদ যত কঠিনই হোক না কেন, আল্লাহ্র স্মরণ সে সমস্ত হওয়ায় উড়িয়ে দেয় এবং মানুষের মন-মানসকে বলিষ্ঠ ও পদক্ষেপকে সুদৃঢ় করে রাখে।

কোরআনে করীম এহেন শঙ্কাপূর্ণ পরিবেশে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্কে স্মরণ করার শিক্ষা দিয়েছে; তাও আবার অধিক পরিমাণে স্মরণ করার তাকীদসহ।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, সমগ্র কোরআনে আল্লাহ্র যিকর ব্যতীত অন্য কোন এবাদতই এত অধিক পরিমাণে করার হুকুম কোথাও উল্লেখ নেই। তার কারণ এই যে, আল্লাহ্র যিকর তথা স্মরণ এমন সহজ একটি এবাদত যে, তাতে না তেমন কোন বিরাট সময় ব্যয় হয়, না পরিশ্রম এবং নাইবা অন্য কোন কাজের কোন রকম ব্যাঘাত ঘটে। তদুপরি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে আল্লাহ্র যিকরের জন্য কোন শর্তাশর্ত, কোন বাধ্যবাধকতা, ওযু কিংবা পবিত্রতা পোশাকাশাক এবং কেবলামুখী হওয়া প্রভৃতি কোন নিয়মই আরোপ করেননি। যে কোন মানুষ যে কোন অবস্থায় ওযুর সাথে, বিনা ওযুতে, দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে যেভাবে ইচ্ছা আল্লাহ্কে স্মরণ করতে পারে। এর পরেও যদি ইমাম জাযারীর গবেষণার বিষয়টি তুলে ধরা যায়, যা তিনি হিসনে হাসীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্র যিকর শুধু মুখে কিংবা মনে মনে যিকর

করাকেই বলা হয় না বরং প্রতিটি জায়েয বা বৈধ কাজ আল্লাহ্-রাসূলের আনুগত্যের আওতায় থেকে করা হলে সে সবই যিকরুল্লাহ্র অন্তর্ভুক্ত, তবে এই পর্যালোচনা অনুযায়ী যিক্রুল্লাহ্র মর্ম এত ব্যাপক ও সহজ হয়ে যায় যে, নিদ্রিত মানুষকেও যাকের বলা যেতে পারে। যেমন কোন কোন রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে— "আলেম ব্যক্তির ঘুমও এবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত"। কারণ, যে আলেম তার এলেমের চাহিদা অনুযায়ী আমল করেন তার জন্য তাঁর নিদ্রা, তাঁর জাগরণ সবাই আল্লাহ্র আনুগত্যের আওতাভুক্ত হওয়া অপরিহার্য।

যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহ্কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করার নির্দেশটিতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুজাহেদীনের জন্য একটি কাজ বাড়িয়ে দেয়া হল বলে মনে হয় যা স্বভাবতঃই কষ্ট ও পরিশ্রমসাধ্য হবে, কিন্তু আল্লাহ্র যিক্রের এটা এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য যে, তাতে কখনও কোন পরিশ্রম তো হয়ই না, বরং এতে একটা সুখকর অনুভূতি, একটা শক্তি এবং একটা পৃথক স্বাদ অনুভূত হতে থাকে যা মানুষের কাজ-কর্মে অধিকতর সহায়ক হয়। তাছাড়া এমনিতেও কষ্ট-পরিশ্রমের কাজ যারা করে থাকে তাদের অভ্যাস থাকে কোন একটা বাক্য কিংবা কোন গানের কলি কাজের ফাঁকেও গুনগুনিয়ে পড়তে বা গাইতে থাকার। সুতরাং কোরআন করীম মুসলমানগণকে তার একটি উত্তম বিকল্প দিয়েছে যা হাজারো উপকারিতা ও তাৎপর্যমণ্ডিত। সে কারণেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ, তোমরা যদি দৃঢ়তা এবং আল্লাহ্র যিকরের দু'টি গোপন রহস্য স্মরণ রাখ এবং কর্মক্ষেত্রে সেগুলো প্রয়োগ কর, তবে বিজয় ও কৃতকার্যতা তোমাদেরই হবে।

যুদ্ধক্ষেত্রের একটি যিকর তো হলো তাই, যা সাধারণতঃ 'না'রায়ে তকবীর শ্লোগানের মাধ্যমে করা হয়। এছাড়া আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসার খেয়াল রাখা, তাঁরই উপর নির্ভর করতে থাকা, তাঁর কথা মনে রাখা প্রভৃতি সবই যিক্রুল্লাহ' – এর অন্তর্ভুক্ত।

৪৬ তম আয়াতে তৃতীয় আরেকটি বিষয়ের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ "আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্যকে অপরিহার্যভাবে পালন কর"। কারণ, আল্লাহ্র সাহায্য-সমর্থন শুধুমাত্র তাঁর আনুগত্যের মাধমেই অর্জন করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে পাপকর্ম ও আনুগত্যহীনতা আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টি ও বঞ্চিতির কারণ হয়ে থাকে। এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য কোরআনী হেদায়েতনামার তিনটি ধারা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তা হল দৃঢ়চিত্ততা, আল্লাহ্র যিকর ও আনুগত্য। অতঃপর وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا আয়াতে ক্ষতিকর দিক-গুলোর উপর আলোকপাত করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই বলা হয়েছে وَلَا تَنَازَعُوْا অর্থাৎ, তোমরা পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হয়ো না। তা হলে তোমাদের মাঝে সাহসহীনতা বিস্তার লাভ করবে এবং তোমাদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে, তোমরা হীনবল হয়ে পড়বে।

তারপর وَاصْبِرُوْا (অবশ্য অবশ্যই ধৈর্যধারণ কর।) বাক্যের বিন্যাসধারায় প্রতীয়মান হয় যে, এতে বিবাদ-বিসংবাদ থেকে রক্ষা পাবার একান্ত কার্যকর ব্যবস্থা বাতলে দেয়া হয়েছে। এর বিশ্লেষণ এই যে, কোন দলের মত ও উদ্দেশে যত ঐক্যই থাক না কেন, কিন্তু ব্যক্তি মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাছাড়া কোন উদ্দেশ্য লাভের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞ, বুদ্ধিজীবীদের মতপার্থক্য থাকা অপরিহার্য। কাজেই অন্যের সাথে চলতে গিয়ে এবং অন্যকে সঙ্গে রাখতে গিয়ে মানুষকে স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয়েও দৈর্যধারণ ও সহনশীলতার মনোভাব গড়ে তোলা এবং নিজের মতের উপর এত অধিক দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা না থাকা উচিত যা গৃহীত না হলে খেপে যায়। এই গুণের অপর নামই হ'ল 'ছবর'। ইদানীং এ কথাটি সবাই জানে এবং বলেও থাকে যে, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করা অত্যন্ত মন্দ কাজ। কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকার মূল কথা 'ছবর' অবলম্বনে অভ্যস্ত হওয়া এবং নিজের মত মানবার ফিকিরে খেপে না যাওয়ার গুণটি অতি অল্প লোকের মাঝেই পাওয়া যায়। সে কারণেই ঐক্য ও একতার যাবতীয় ওয়াজ-নসীহতই নিষ্ফল হয়ে যায়।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে কোরআন করীম وَلَا تَنَازَعُوْا বলেছে। অর্থাৎ, পারস্পরিক বিবাদ-দ্বন্দ্ব থেকে বিরত করেছে, মতের পার্থক্য কিংবা তা প্রকাশ করতে বাধা দেয়নি। যে ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের সাথে সাথে নিজের মত অন্যকে মানাবার প্রেরণা কার্যকর থাকে তাকেই বলা হয় বিবাদ ও বিসংবাদ। আর এটিই হল সে প্রেরণা যাকে কোরআন করীম — وَاصْبِرُوْا শব্দে ব্যক্ত করেছে এবং সবশেষে 'ছবর' অবলম্বনের এক বিরাট উপকারিতার কথা বলে এর তিক্ততা দূর করে দিয়েছে যে,

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (যারা ছবর তথা ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে রয়েছেন।) এটি এমন এক মহাসম্পদ যে, ইহ পর-কালের যাবতীয় সম্পদ এর মোকাবেলায় নগণ্য।

ইমাম ইবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত ক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, মক্কার কোরায়েশ বাহিনী যখন মুসলমানদের সাথে মোকাবেলার উদ্দেশে রওয়ানা হয়, তখন তাদের মনে এমন এক আশঙ্কা চেপে ছিল যে, আমাদের প্রতিবেশী বনূ-বকর গোত্রও আমাদের শত্রু; আমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে চলে গেলে সেই সুযোগে এই শত্রু গোত্র না আবার আমাদের বাড়ী-ঘর এবং নারী-শিশুদের উপর হামলা করে বসে ! সুতরাং কাফেলার নেতা আবু সুফিয়ানের ভয়ার্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ি থেকে তারা বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু মনের এ আশঙ্কা তাদের পায়ের বেড়ী হয়ে রইল। এমনি সময় শয়তান সোরাকা ইবনে মালেকের রূপে এমনভাবে সামনে এসে উপস্থিত হল যে, তাঁর হাতে রয়েছে একটি পতাকা আর তাঁর সাথে রয়েছে বীর সৈনিকদের একটি খণ্ড দল। সোরাকা ইবনে মালেক ছিল সে এলাকার এবং গোত্রের বড় সর্দার। কোরায়েশদের মনে তারই আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। সে এগিয়ে গিয়ে কোরায়েশ জোওয়ানদের বাহিনীকে লক্ষ্য করে এক ভাষণ দিয়ে বসল এবং দু'ভাবে তাদেরকে প্রতারিত করল। প্রথমতঃ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ, আজকের দিনে এমন কেউ নেই যারা তোমাদের উপর জয়লাভ করতে পারে। এর উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, আমি তোমাদের প্রতিপক্ষ সম্পর্কেও অবগত রয়েছি এবং তোমাদের শক্তি সামর্থ্য ও সংখ্যাধিক্য তো চোখেই দেখছি, কাজেই তোমাদের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তোমরা নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাও, তোমরাই প্রবল থাকবে, তোমাদের মোকাবেলায় বিজয় অর্জন করবে, এমন কেউ নেই।

দ্বিতীয়তঃ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ অর্থাৎ, বনূ-বকর প্রভৃতি গোত্রের ব্যাপারে তোমাদের মনে যে আশঙ্কা চেপে আছে যে, তোমাদের অবর্তমানে তারা মক্কা আক্রমণ করে বসবে, তার দায়-দায়িত্ব আমি নিয়ে নিচ্ছি যে, এমনকি

না; আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি। মক্কার কোরায়েশরা সোরাকা মালেক এবং তার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব–প্রতিপত্তি সম্পর্কে পূর্ব অবগত ছিল। কাজেই তার বক্তব্য শোনামাত্র তা তাদের মনে বসে এবং বনু–বকর গোত্রের আমক্রমণাশঙ্কা মুক্ত হয়ে মুসলমানদের বেলায় উদ্বুদ্ধ হল।

দ্বিবিধ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে নিজেদের বধ্যভূমির দাবড়ে দিল। কিন্তু– فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ যখন মক্কার মুশরেক ও মুসলমানদের উভয় দল (বদর প্রাঙ্গণে) সমরে লিপ্ত হল, তখন শয়তান পেছন ফিরে পালিয়ে গেল।

বদর যুদ্ধে যেহেতু মক্কার মুশরেকদের সহায়তায় একটি শয়তানী ীও এসে উপস্থিত হয়েছিল, কাজেই আল্লাহ্ তাআলা তাদের কাবেলায় হযরত জিব্‌রাঈল ও মীকাঈল (আঃ)–এর নেতৃত্বে রেশতাদের বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম ইবনে জরীর হযরত ইবনে বাসের (রাঃ) রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, শয়তান যখন রাকা ইবনে মালেকের রূপে স্বীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল, তখন সে বরাঈল–আমীন এবং তাঁর সাথী ফেরেশতা বাহিনী দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে সময় তার হাত এক কোরায়শী যুবক হারেছ ইবনে হাশামের হাতে ধরা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে চাইল। হারেছ তিরস্কার করে বলল, এ কি করছ! তখন সে বুকের উপর এক প্রবল ঘা মেরে হারেছকে ফেলে দিল এবং নিজের বাহিনী নিয়ে পালিয়ে গেল। হারেছ তাকে সোরাকাহ্ মনে করে বলল, হে আরব সর্দার সোরাকাহ্, তুমি তো বলেছিলে, আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি। অথচ ঠিক যুদ্ধের ময়দানে এমন আচরণ করছ! তখন শয়তান সোরাকাহ্‌র বেশেই উত্তর দিল, إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ

অর্থাৎ, আমি তোমাদের সাথে কৃত চুক্তি থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি। কারণ, আমি এমন জিনিস দেখছি যা তোমাদের চোখ দেখতে পায় না। অর্থাৎ, ফেরেশতা বাহিনী। তাছাড়া আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি। কাজেই তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি।

শয়তান যখন ফেরেশতা বাহিনী দেখতে পেল এবং সে যেহেতু তাদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিল, তখন বুঝল যে, এবার আর পরিত্রাণ নেই। তবে তার বাক্য 'আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি' । সম্পর্কে তফসীর শাস্ত্রের ইমাম কাতাদাহ্ বলেন যে, কথাটি সে মিথ্যা বলেছিল। সত্যি সত্যিই যদি সে আল্লাহ্‌কে ভয় করত, তাহলে নাফরমানী করবে কেন? কিন্তু অধিকাংশ মনীষী বলেছেন যে, ভয় করাও যথাস্থানে ঠিক। কারণ, সে যেহেতু আল্লাহ্ তাআলার পরিপূর্ণ কুদরত তথা মহা ক্ষমতা এবং কঠিন আযাব সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত, কাজেই ভয় না করায় কোন কারণ থাকতে পারে না। তবে ঈমান ও আনুগত্য ছাড়া শুধু ভয় করা কোন লাভ নেই।

শয়তানের প্রতারণা থেকে বাঁচার উপায় ঃ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘটনা থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যাচ্ছে ঃ

(১) শয়তান মানুষের জাতশত্রু, তাদের ক্ষতি সাধনের জন্য সে নানা রকম কলা–কৌশল ও চাল–ছলনার আশ্রয় নেয় এবং বিভিন্ন রূপ বদলাতে থাকে। কোন কোন সময় শুধু মনে ওসওয়াসা সৃষ্টি করে পেরেশান করে তোলে, আবার কখনো সামনাসামনি এসে ধোঁকা দেয়।

(২) শয়তানকে আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমতা দান করেছেন যে, সে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। জনৈক প্রখ্যাত হানাফী ফেকাহ্‌বিদের গ্রন্থ 'আকামুল–মার্জান ফী আহ্‌কামিল্ জানান'–এ বিষয়টি সবিস্তারে প্রমাণ করা হয়েছে। সে কারণেই গবেষক সুফী মনীষীবৃন্দ যারা আধ্যাত্মিক কাশ্‌ফ ও দর্শনের ক্ষমতা রাখেন তারা মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কোন লোককে দেখেই কিংবা তার কথাবার্তা শুনেই কোন রকম অনুসন্ধান না করে তার পেছনে চলতে আরম্ভ করা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে থাকে—এমন কি কাশ্‌ফ ও এলহামেও শয়তানের পক্ষ থেকে সংমিশ্রণ হয়ে যেতে পারে।

কৃতকার্যতার জন্য নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়, পথের সরলতাও অপরিহার্য ঃ

(৩) যেসব লোক কুফর ও শিরক কিংবা অন্য কোন অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তার কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই হয়ে থাকে যে, শয়তান তাদের দুষ্কর্মকে সুন্দর, প্রশংসনীয় এবং কল্যাণকর হিসাবে প্রকাশ করে তাদের মন–মস্তিষ্ককে ন্যায় ও সত্য এবং প্রকৃত পরিণতি থেকে ফিরিয়ে দেয়। তারা নিজেদের অন্যায়কেই ন্যায় এবং মন্দকেই ভাল মনে করতে শুরু করে। ন্যায়পন্থীদের মত তারাও নিজেদের অন্যায়–অসত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে তৈরী হয়ে যায়। সেজন্য কোরায়েশ বাহিনী এবং তার সর্দার যখন বায়তুল্লাহ থেকে বিদায় নিচ্ছিল তখন বায়তুল্লাহর সামনে এসব শব্দে প্রার্থনা করে বলেছিল – اللهم انصر اهدى الطائفتين – অর্থাৎ, আয় আল্লাহ্, উভয় দলের যেটি অধিকতর সৎপন্থী তারই সাহায্য করো তাকেই বিজয় দান করো। এই অজ্ঞ লোকেরা শয়তানের প্রতারণায় পড়ে নিজেরা নিজেদেরকেই অধিক হেদায়েত–প্রাপ্ত এবং ন্যায়পন্থী বলে মনে করত। আর পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে নিজেদের মিথ্যা ও অন্যায়ের সাহায্য ও সমর্থনে জান–মাল কোরবান করে দিত।

এতেই প্রতীয়মান হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমল তথা কার্যকলাপের গতি–প্রকৃতি সঠিক না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে মুসলমানদের ব্যাপারে মদীনার মুনাফেক ও মক্কার মুশরেকদের একটি যৌথ সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে যা তাদের জন্য দুঃখ করেই যেন বলা হয়েছিল। তা হচ্ছে এই غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ অর্থাৎ, বদরের ময়দানে মুষ্টিমেয় এই মুসলমানরা যে এহেন বিরাট শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে এসেছে, তা এই বেচারাদেরকে তাদের দ্বীনই প্রতারণায় ফেলে মৃত্যুর মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের উত্তরে বলেছেন وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থাৎ, যে লোক আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করে, জেনে রাখো, সে কখনও আপমানিত ও অপদস্ত হয় না। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা সব কিছুর উপর পরাক্রমশীল। তাঁর কৌশলের সামনে সবার জ্ঞান–বুদ্ধিই বিকল হয়ে যায়। মর্মার্থ এই যে, তোমরা শুধু বস্তু ও বস্তুজগত সম্পর্কেই অবগত এবং তারই উপর নির্ভর কর। কিন্তু সেই গোপন শক্তি সম্পর্কে তোমাদের কোন খবরই নেই, যা বস্তু ও বস্তুজগতের স্রষ্টা আল্লাহ্ তাআলার ভান্ডারে রয়েছে এবং যা তাঁর উপর ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকদের সঙ্গে থাকে।

ইদানিংকালেও সরল সোজা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দেখে তথাকথিত অনেক বিজ্ঞ–বুদ্ধিমান বলে থাকে—এরা সেকেলে, এদের কিছু বলো নাক। কিন্তু এদের মধ্যে যদি আল্লাহ্‌র উপর পরিপূর্ণ ঈমান ও ভরসা থাকে, তবে

এতে তাদের কিছুই অনিষ্ট হতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্ববর্তী দু'আয়াতে কাফেরদের মৃত্যুকালীন আযাব এবং ফেরেশতাদের সতর্কীকরণের আলোচনা করা হয়েছে। এতে নবী করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ কাফেরদের রূহ কবজ করছিলেন, তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করছিলেন এবং বলছিলেন যে, আগুনে জ্বলার আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর; আপনি যদি সে সময়ে তাদের অবস্থা দেখতেন, তখন আপনি এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পেতেন।

তফসীরশাস্ত্রের ইমামগণের কেউ কেউ এ বিবরণকে সে সমস্ত কোরায়েশ কাফেরের অবস্থা বলে সাব্যস্ত করেছেন, যারা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতা বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে এর অর্থ হবে এই যে, বদর যুদ্ধে যে সব কাফের সর্দার নিহত হয় তাদের মৃত্যুতে ফেরেশতাদের হাত ছিল। তাঁরা তাদেরকে সামনের দিক দিয়ে তাদের মুখে এবং পেছন দিক থেকে তাদের পিঠে আঘাত করে তাদের হত্যা করছিলেন আর সেই সঙ্গে আখেরাতে জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে তাদের সংবাদ দিয়ে দিচ্ছিলেন।

আর যারা আয়াতের শব্দের ব্যাপকতারভিত্তিতে এর বিষয়বস্তুকেও ব্যাপক হিসাবেই গ্রহণ করেছেন তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যখন কোন কাফের মৃত্যুবরণ করে, তখন মওতের ফেরেশতা রূহ কবজ করার সময় তার মুখে ও পিঠে আঘাত করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তাঁদের হাতে আগুনের চাবুক এবং লোহার গদা থাকে যার দ্বারা মরণোম্মুখ কাফেরকে আঘাত করা হয়। কিন্তু যেহেতু এই আযাবের সম্পর্ক জড়জগতের সাথে নয়, বরং কবর জগতের সাথে যাকে বরযখ বলা হয়, কাজেই এই আযাব সাধারণতঃ চোখে দেখা যায় না।

সেইজন্যই রসুলে করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যদি আপনি দেখতেন, তবে বড়ই করুণ দৃশ্য দেখতে পেতেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মৃত্যুর পর আলমে বরযখেও অর্থাৎ, মৃত্যুর পর থেকে কেয়ামতের বিচারের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের কাফেরদের উপর আযাব হয়ে থাকে। তাই তা সাধারণভাবে দেখা যায় না। কোরআন মজীদের অন্যান্য আয়াতে এবং হাদীসের বর্ণনাতেও কবর আযাবের ব্যাপারে বিপুল আলোচনা রয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, দুনিয়া ও আখেরাতে এ আযাব তোমাদের নিজের হাতেরই অর্জিত। সাধারণ কাজকর্ম যেহেতু হাতের দ্বারা সম্পাদিত হয়, সেহেতু এখানেও হাতেরই উল্লেখ করা হয়েছে। মর্মার্থ হল এই যে, এসব আযাব তোমাদের নিজেদের আমলেরই ফলাফল। আর একথা সত্য যে, আল্লাহ্ তাঁর বন্দার উপর যুলুমকারী নন যে, অকারণেই কাউকে আযাবে নিপতিত করে দেবেন।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব অপরাধীর উপর আল্লাহ্ তাআলার এই আযাব নতুন কিছু নয়, বরং এটাই আল্লাহ্ তাআলার সাধারণ রীতি যে, তিনি তাঁর বন্দাদের হেদায়েতের জন্য তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেন, আশে-পাশে তাদের জন্য এমন অসংখ্য বিষয় বিদ্যমান থাকে যেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেই তারা আল্লাহ্ তাআলার অসীম কুদরত ও মহত্ব সম্পর্কে জানতে পারে এবং অসহায় সৃষ্টিকে আর তাঁর সাথে শরীক করে না। তদুপরি অতিরিক্ত সতর্কীকরণের জন্য নবী-রসূল পাঠান। আল্লাহ্র রসূল তাদের বুঝতে ও বোঝাতে সামান্যতম ত্রুটিও রাখেন না। তাঁরা তাদেরকে মুজেযা আকারে আল্লাহ্ তাআলার ভয়ানক ক্ষমতার দৃশ্যাবলীও দেখান। তারপরেও যখন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় এ সমস্ত বিষয়ে চোখ বন্ধ করে নেয় এবং খোদায়ী সতর্কতার কোনটিতেই কান দেয় না, তখন এহেন লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলার রীতি হল এই যে, পৃথিবীতেও তাদের উপর আযাব নেমে আসে এবং আখেরাতেও অন্তহীন আযাবে বন্দী হয়ে যায়। এরশাদ হয়েছে – كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ – داب – অর্থাৎ, রীতি, অভ্যাস। অর্থাৎ, ফেরাউনের অনুসারী এবং তাদের পূর্ববর্তী কাফের ও উদ্ধত লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলার রীতি সম্পর্কে গোটা বিশ্বই জানতে পেরেছে যে, তিনি ফেরাউনকে তার সমস্ত আড়ম্বর ও প্রভাব-প্রতিপত্তিসহ সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছেন এবং তার পূর্ববর্তী আদ ও সামূদ জাতিসমূহকে বিভিন্ন প্রকৃতির আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছেঃ

كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্ তাআলার আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে স্বীয় আযাবে নিপতিত করেছেন। اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ আল্লাহ্ অত্যন্ত শক্তিশালী, কোন ক্ষমতাবানই নিজের শক্তির বলে তাঁর আযাব থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। আর আল্লাহ্ তাআলার শাস্তিও অত্যন্ত কঠিন।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى
يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٣﴾ كَدَاْبِ اٰلِ
فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ
بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥٤﴾
اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٥﴾
اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ
مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٦﴾ فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ
مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ
خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ﴿٥٨﴾
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ؕ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَ
اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ
لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ
فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦١﴾

(৫৩) তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ কখনও পরিবর্তন করেন না সে সব নেয়ামত, যা তিনি কোন জাতিকে দান করেছিলেন, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই পরিবর্তিত করে দেয় নিজের জন্য নির্ধারিত বিষয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (৫৪) যেমন ছিল রীতি ফেরাউনের বংশধর এবং যারা তাদের পূর্বে ছিল, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শনসমূহকে। অতঃপর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের পাপের দরুন এবং ডুবিয়ে মেরেছি ফেরাউনের বংশধরদেরকে। বস্তুতঃ এরা সবাই ছিল যালেম। (৫৫) সমস্ত জীবের মাঝে আল্লাহ্র নিকট তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যারা অস্বীকারকারী হয়েছে, অতঃপর আর ঈমান আনেনি। (৫৬) যাদের সাথে তুমি চুক্তি করেছ তাদের মধ্য থেকে অতঃপর প্রতিবার তারা নিজেদের কৃত চুক্তি লংঘন করে এবং ভয় করে না। (৫৭) সুতরাং যদি কখনো তুমি তাদেরকে যুদ্ধে পেয়ে যাও, তবে তাদের এমন শাস্তি দাও, যেন তাদের উত্তরসূরিরা তাই দেখে পালিয়ে যায়; তাদেরও যেন শিক্ষা হয়। (৫৮) তবে কোন সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় থাকে, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দাও এমনভাবে যেন হয়ে যাও তোমরা ও তারা সমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধোঁকাবাজ, প্রতারককে পছন্দ করেন না। (৫৯) আর কাফেররা যেন একথা মনে না করে যে, তারা বেঁচে গেছে; কখনও এরা আমাকে পরিশ্রান্ত করতে পারবে না। (৬০) আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহ্র শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না ; আল্লাহ্ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ্র রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না। (৬১) আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সে দিকেই আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রবণকারী; পরিজ্ঞাত।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামী তাঁর নেয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য এবং তা অব্যাহত রাখার জন্য একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। এরশাদ হয়েছে—

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا
بِاَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা কোন জাতিকে যে নেয়ামত দান করেন তিনি তা ততক্ষণ পর্যন্ত বদলান না, যে পর্যন্ত না সে জাতি নিজেই নিজেদের অবস্থা ও কার্যকলাপ বদলে দেয়।

এখানে প্রথম লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ নেয়ামত দান করার অন্য কোন মূলনীতি বর্ণনা করেননি। না সে জন্য কোন রকম বাধ্যবাধকতা ও শর্তাশর্ত আরোপ করেছেন, না কারো কোন সৎকর্মের উপর তা নির্ভরশীল রেখেছেন। তার কারণ যদি এমনই হতো, তবে সর্বপ্রথম নেয়ামত আমাদের অস্তিত্ব যাতে আল্লাহ্র আশ্চর্যজনক শিল্পকর্মের হাজারো বিস্ময়কর নেয়ামতের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে—বলাইবাহুল্য, এসব নেয়ামত সে সময় দান করা হয়, যখন না ছিলাম আমরা, না ছিল আমাদের কোন আমল বা কাজকর্ম।

কাজেই যদি আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত ও অনুগ্রহসমূহ বান্দার সৎকর্মের অপেক্ষা থাকত, তবে আমাদের অস্তিত্বই স্থাপিত হতো না।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত ও রহমত তথা তাঁর দান ও করুণা তাঁর রাব্বুল আলামীন ও রাহমানুররাহীম গুণেই প্রকৃতিগত ফসল। অবশ্য এ সমস্ত নেয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য একটা নিয়ম বা মূলনীতি রয়েছে। যা এ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে যে, যে জাতিকে আল্লাহ্ তাআলা কোন নেয়ামত দান করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তা তাদের কাছে থেকে ফিরিয়ে নেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা ও কার্যকলাপকে পরিবর্তিত করে আল্লাহ্ তা'আলার আযাবকে আমন্ত্রণ জানায়।

অবস্থা পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে ভাল ও সৎ অবস্থা ও কর্মের পরিবর্তে মন্দ অবস্থা ও কার্যকলাপ অবলম্বন করে নেয়া কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত আগমনের সময় যে সমস্ত মন্দ ও পাপ কাজে লিপ্ত ছিল নেয়ামত প্রাপ্তির পর তার চেয়ে অধিক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়া।

এই বিশ্লেষণের দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, বিগত আয়াতগুলোতে যে সমস্ত জাতি-সম্প্রদায়ের আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ, কোরায়েশ গোত্রের কাফেররা এবং ফেরাউনের সম্প্রদায়; এ আয়াতের সাথে তাদের সম্পর্ক এ কারণে যে, এরা যদিও আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতপ্রাপ্তির সময়ও তেমন কোন ভাল অবস্থায় ছিল না; সবাই ছিল মুশিরক ও কাফের, কিন্তু নেয়ামতপ্রাপ্তির পর এরা নিজেদের মন্দাচার ও অসৎ কর্মে পূর্বের চাইতে বহুগুণে বেশী তৎপর হয়ে উঠে।

ফেরাউনের বংশধররা বনী-ইসরাঈলদের উপর নানা করম অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ করে এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলা ও বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। যা ছিল তাদের পূর্ববর্তী অপরাধে আরেকটি সংযোজন। এতেকরে তারা নিজেদের অবস্থাকে অধিকতর কল্যাণের

দিকে প্রত্যাবর্তিত করে দেয়। তখন আল্লাহ্ তাআলাও তাঁর নেয়ামতকে বিপদাপদ ও শাস্তি-সাজায় বদলে দেন। তেমনিভাবে মক্কার কোরায়েশরা যদিও মুশরিক ও বদকার ছিল, কিন্তু তার সাথে সাথে তাদের মাঝে কিছু সৎকর্ম, সেলাহ্-রেহমী, তথা স্বজনবাৎসল্য, মেহমান-নাওয়াযী তথা অতিথিপরায়ণতা, হাজীদের সেবা, বায়তুল্লাহ্র প্রতি সম্মানবোধ প্রভৃতি কিছু সদগুণও বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাদের জন্য দ্বীন-দুনিয়ার নেয়ামতরাজির দরজা খুলে দিয়েছেন; দুনিয়াতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি দান করেছেন। যেসব দেশে কারো বাণিজ্যিক কাফেলা নিরাপদে অতিক্রম করতে পারত না সেসব দেশে—যেমন, সিরিয়া ও ইয়ামেনে তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা যেত এবং একান্ত নিরাপদে লাভবান হয়ে ফিরে আসত।

আর দ্বীনের দিক দিয়ে সে মহা-নেয়ামত তাদের দান করা হয়েছে যা বিগত কোন জাতি-সম্প্রদায়ই পায়নি। তাদেরই মাঝে আবির্ভূত হন নবীকুল শিরোমণি সর্বশেষ নবী (সাঃ) এবং তাদেরই মাঝে অবতীর্ণ হয় আল্লাহ্ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ কোরআন করীম।

কিন্তু এরা আল্লাহ্ তাআলার এসমস্ত দান ও অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া আদায় করা, এর যথার্থ মর্যাদা দান এবং এগুলোর মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার সংশোধন করার পরিবর্তে আগের চেয়েও বেশী পঙ্কিলতায় মজে যায়। সেলাহ্-রেহমী পরিহার করে মুসলমান হয়ে যাওয়ার অপরাধে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর চরম বর্বরতাসুলভ উৎপীড়ন চালাতে আরম্ভ করে, অতিথিপরায়ণতার পরিবর্তে সেই মুসলমানদের জন্য দানা-পানি বন্ধ করার প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করে, হাজীদের সেবা করার পরিবর্তে মুসলমানদের হরমে প্রবেশে পর্যন্ত বাধা দান করতে থাকে। এগুলো ছিল সেসব অবস্থা যাকে কোরায়েশ কাফেররা পরিবর্তিত করে ফেলেছিল। এরই পরিণতিতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নেয়ামতসমূহকে বিপদাপদ ও আযাবে রূপান্তরিত করে দেন। ফলে এরা দুনিয়াতেও অপদস্থ হয় এবং যে সত্তা দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য রাহ্মাতুল্ লিল আলামীন হয়ে আগমন করেছিলেন তাঁরই মাধ্যমে এরা নিজেদের মৃত্যু ও ধ্বংসকে আমন্ত্রণ জানায়।

তফসীরে-মাযহারীতে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিলাব ইবনে মুররা যিনি রসূলে করীম (সাঃ)-এর বংশ পরম্পরায় তৃতীয় পুরুষে পরদাদা হিসাবে গণ্য। তিনি প্রথম থেকেই দ্বীনে-ইবরাহীমী ও ইসমাঈলীর অনুগামী ছিলেন এবং বংশানুক্রমিকভাবে এ দ্বীনের নেতৃত্ব ও পৌরোহিত্য তাদেরই হাতে ন্যস্ত ছিল। কোসাই ইবনে কিলাবের সময়ে তাদের মধ্যে মূর্তি উপাসনার সূচনা হয়। তাঁর পূর্বে তাদের ধর্মীয় নেতা ছিলেন কা'আব ইবনে লুওয়াই। তিনি জুমার দিন যাকে তাদের ভাষায় 'আরোবিয়া' বলা হয় (সমাজের) সবাইকে সমবেত করে ভাষণ দিতেন এবং বলতেন যে, তার সন্তানবর্গের মাঝে শেষনবী (সাঃ)-এর জন্ম হবে। তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করা সবার জন্য অপরিহার্য হবে। যে লোক তাঁর উপর ঈমান আনবে না, তার কোন আমলই কবুল হবে না। মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে তার আরবী কবিতা জাহেলিয়াত আমলের কবিদের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই কোসাই ইবনে কিলাব সমস্ত হাজীর জন্য খানাপিনার ব্যবস্থা করতেন। এমনকি এ দায়িত্বটি মহানবী (সাঃ)-এর বংশে তাঁর আমলেও বলবৎ ছিল। এই ইতিহাসের দ্বারা একথাও বলা যেতে পারে যে, কোরায়েশদের পরিবর্তনের মর্ম হল দ্বীনে-ইবরাহীমী পরিহার করে মূর্তি উপাসনা আরম্ভ করা।

যাহোক, আয়াতের প্রতিপাদ্যে এ কথা বোঝা যাচ্ছে যে, কোন কোন সময় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নেয়ামত এমন কোন কোন লোককেও দান করেন, যে তার আমল বা কর্মের দ্বারা তার যোগ্য নয়, কিন্তু প্রদত্ত হওয়ার পর যদি সে নিজের আমল বা কর্মধারা সংশোধন করে কল্যাণের দিকে ফিরানোর পরিবর্তে মন্দ কাজের দিকেই আরো বেশী উৎসাহী হয়ে পড়ে, তখন প্রদত্ত নেয়ামত তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং সে লোক আল্লাহ্র আযাবের যোগ্য হয়ে পড়ে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে— وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাদের প্রতিটি কথাবার্তা শুনেন এবং তাদের সমস্ত আমল ও কার্যকলাপ জানেন। এতে কোন রকম ভুল-বিভ্রান্তির কোনই অবকাশ নেই।

উল্লেখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তু বরং শব্দাবলীও প্রায় তেমনি, যা এক আয়াত আগেই আলোচিত হয়েছে।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এতে دواب শব্দটি دابة-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী। মানুষসহ যত প্রাণী ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করে সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে সাধারণ প্রচলনে এ শব্দটি বিশেষ করে চতুষ্পদ জীবের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেহেতু নির্বুদ্ধিতা ও অনুভূতিহীনতার দিক দিয়ে তাদের অবস্থা চুতষ্পদ জীব-জানোয়ার অপেক্ষাও নীচে নেমে গিয়েছিল, কাজেই তাদেরকে বোঝাতে গিয়ে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট যে, সমস্ত জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে এরাই সবচেয়ে নিকৃষ্টতর। আয়াতের শেষাংশে রয়েছে- فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ, এরা ঈমান আনবে না। মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে যেসব যোগ্যতা দান করেছিলেন, তারা সে সবই হারিয়ে ফেলেছে এবং চুতষ্পদ জীব-জানোয়ারেরই মত পানাহার ও নিদ্রা-জাগরণকেই জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছে। কাজেই ঈমান পর্যন্ত তাদের পৌঁছা হবে না।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতটি ইহুদী সম্প্রদায়ের ছ'জন লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা পূর্বাহ্নেই সংবাদ দিয়ে দিয়েছেন যে, এরা শেষ পর্যন্ত ঈমান আনবে না।

اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ – এ আয়াতটি মদীনার ইহুদী এবং বনূ-কোরায়যা ও বনূ-নাযীর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতগুলো মক্কার মুশরিকদের উপর বদর ময়দানে মুসলমানদের মাধ্যমে আল্লাহ্র আযাব অবতীর্ণ হওয়ার বিষয় আলোচনা এবং পূর্ববর্তী উম্মতের কাফেরদের সাথে তাদের সামঞ্জস্যের বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সে যালেম দলের আলোচনা করা হয়েছে যারা মদীনায় হিজরতের পর মুসলমানদের জন্য আস্তীনের সাপে পরিণত হয় এবং যারা একদিকে মুসলামানদের বন্ধুত্ব ও সখ্যতার দাবীদার ছিল এবং অপরদিকে মক্কার কাফেরদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত। ধর্মমতের দিক দিয়ে এরা ছিল ইহুদী। মক্কার মুশরেকদের মাঝে আবু-জাহ্ল যেমন ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে অগ্রবর্তী ছিল, তেমনি মদীনার ইহুদীদের মধ্যে এ কাজের নেতা ছিল কা'আব ইবনে

আশরাফ।

রসূলে করীম (সাঃ) হিজরত করে মদীনায় চলে আসার পর মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে এরা ভীত হলেও তাদের মনে ইসলামের প্রতি শত্রুতার এক দাবদাহ জ্বলেই যাচ্ছিল।

ইসলামী জাতীয়তা ঃ রসূলে করীম (সাঃ) মদীনায় আগমনের পর ইসলামী রাজনীতির সর্বপ্রথম বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করেন। মুহাজেরীন ও আনসারদের স্বদেশী ও স্বজাতীয় সাম্প্রদায়িকতাকে মিটিয়ে দিয়ে ইসলামের নামে এক নতুন জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাজেরীন ও আনসারদের বিভিন্ন গোত্রকে ভাই-ভাইয়ে পরিণত করে দেন। আর হুযুর (সাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা আনসারদের সে সমস্ত বিরোধও দূর করে দেন যা শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে চলে আসছিল। এবং মুহাজেরীনদের সাথেও তিনি পারস্পরিকভাবে ভাই ভাই সম্পর্ক স্থাপন করেন।

ইহুদীদের সাথে মৈত্রী চুক্তি ঃ হিজরতের পর দেখা যায়, মুসলমানদের প্রতিপক্ষ ছিল দু'টি। (১) মক্কার মুশরেকীন, যাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করছিল এবং (২) মদীনার ইহুদীবর্গ, যারা এখন মুসলমানদের প্রতিবেশী হয়েছিল। এদের মধ্য থেকে ইহুদীদের সাথে এক চুক্তি সম্পাদন করা হয়, এবং একটা বিস্তারিত প্রতিজ্ঞা পত্রও লেখা হয়। এই চুক্তির প্রতি আনুগত্য মদীনা এলাকার সমস্ত ইহুদী এবং মুসলমান, আনসার ও মুহাজেরদের উপর আরোপ করা হয়। চুক্তির পূর্ণ ভাষ্য ইবনে-কাসীর 'আলবেদায়াহ্ ওয়ান্নেহায়াহ্' গ্রন্থে এবং সীরাতে ইবনে-হেশাম প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বস্তুতঃ এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই যে, মদীনার ইহুদিগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুকে প্রকাশ্য কি গোপন সাহায্য করবে না। কিন্তু এরা বদর যুদ্ধের সময় সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করে মক্কার মুশরেকদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে, তবে বদর যুদ্ধের ফলাফল যখন মুসলমানদের সুস্পষ্ট বিজয় এবং কাফেরদে অপমানজনক পরাজয়ের আকারে সামনে এসে যায়, তখন পুনরায় তাদের উপর মুসলমানদের প্রভাব ও ভীতি প্রবল হয়ে উঠে এবং তারা মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে ওযর পেশ করে যে, এবারে আমাদের ভুল হয়ে গেছে, এবার বিষয়টি ক্ষমা করে দিন, ভবিষ্যতে আর এমনভাবে আমরা চুক্তি লংঘন করব না।

মহানবী (সাঃ) ইসলামী গাম্ভীর্য, দয়া ও সহনশীলতার প্রেক্ষিতে যা তাঁর অভ্যাস ছিল আবারও তাদের সাথে চুক্তি নবায়ন করে নিলেন। কিন্তু এরা নিজেদের অসৎ স্বভাব থেকে বিরত ছিল না। ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা জানতে পেরে তাদের সাহস বেড়ে যায় এবং তাদের সর্দার কা'আব ইবনে আশরাফ মক্কায় গিয়ে মক্কার মুশরেকদের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং আশ্বাস দেয় যে, মদীনার ইহুদীরা তোমাদের সাথে থাকবে।

এটা ছিল তাদের দ্বিতীয়বারে চুক্তি লঙ্ঘন যা তারা ইসলামের বিরুদ্ধে করেছে। আলোচ্য আয়াতে এভাবে বার বার চুক্তি লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করে তাদের দুষ্কৃতির বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক, যাদের সাথে আপনি চুক্তি সম্পাদন করে নিয়েছেন, কিন্তু এরা প্রতিবারই সে চুক্তি লঙ্ঘন করে চলছে। আয়াতের শেষাংশে এরশাদ হয়েছে ঃ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ, এরা ভয় করে না। এর মর্মার্থ এও হতে পারে যে, এ হতভাগ্যরা যেহেতু দুনিয়ার লোভে উন্মাদ ও অজ্ঞান হয়ে আছে, তাদের মনে আখেরাতের কোন চিন্তাই নেই। কাজেই এরা আখেরাতের আযাবকে ভয় করে না। এছাড়া এও হতে পারে যে, এহেন দুরাচার ও চুক্তি লঙ্ঘনকারী লোকদের যে অশুভ পরিণতি পৃথিবীতেই হয়ে থাকে এরা নিজেদের গাফলতী ও অজ্ঞানতার দরুন সে ব্যাপারেও ভয় করে না।

অতঃপর সমগ্র বিশ্বই স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে যে, এসব লোক নিজেদের দুষ্কর্মের শাস্তি পৃথিবীতেও ভোগ করেছে। আবু জাহ্লের মত কাআব ইবনে আশরাফ নিহত হয়েছে এবং মদীনার ইহুদীদেরকে দেশছাড়া করা হয়েছে।

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

এতে تَثْقَفَنَّهُمْ শব্দটির অর্থ, তাদের উপর ক্ষমতা লাভ করা। আর شرد মূল ধাতু আর تشريد থেকে গঠিত হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ বিতাড়িত এবং বিক্ষিপ্ত করে দেয়া। অতএব, আয়াতের অর্থ হবে যে, "আপনি যদি কোন যুদ্ধে তাদের উপর ক্ষমতা লাভে সমর্থ হয়ে যান, তবে তাদেরকে এমন কঠোর শাস্তি দিন যা অন্যান্যের জন্যও দৃষ্টান্ত হয়ে যায়।" তাদের পশ্চাতে যারা তাদের সহায়তা ও ইসলামের শত্রুতায় লেগে আছে তারাও যেন একথা উপলব্ধি করে নেয় যে, এখান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোই কল্যাণ। এর মর্ম হল এই যে, এদেরকে এমন শাস্তিই যেন দেয়া হয়, যা দেখে মক্কার মুশরেকীন ও অন্যান্য শত্রু সম্প্রদায়গুলোও প্রভাবিত হবে এবং ভবিষ্যতে মুসলমানদের মোকাবেলা করার সাহস করবে না।

আয়াতের শেষাংশে لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ বলে রাব্বুল আলামীনের ব্যাপক রহমতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই সুকঠিন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা নয় বরং এতে তাদেরই কল্যাণ যে, হয়তো বা এহেন অবস্থা দেখে এরা কিছুটা চেতনা ফিরে পাবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে নিজেদের সংশোধন করে নেবে।

সন্ধি চুক্তি বাতিল করার উপায় ঃ পরবর্তী আয়াতে রসূলে মকবুল (সাঃ)-ক যুদ্ধ ও সন্ধির আইনসংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা বলে দেয়া হয়েছে। এতে যদি চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষের দিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতা অর্থাৎ, চুক্তি লংঘনের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে চুক্তির বাধ্যবাধকতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা অপরিহার্য নয়। কিন্তু চুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়ার পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করাও জায়েয নয়। বরং এর বিশুদ্ধ পন্থা হল এই যে, প্রতিপক্ষকে শান্ত পরিস্থিতিতে এবং অবকাশের অবস্থায় এ ব্যাপারে অবহিত করে দিতে হবে যে, তোমাদের কুটিলতা ও বিরুদ্ধাচারণের বিষয়টি আমাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়েছে কিংবা তোমাদের আচার-আচরণ আমাদের সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে, তাই আমরা আগামীতে এই চুক্তি পালনে বাধ্য থাকব না; তোমাদেরও সব রকম অধিকার থাকবে যে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা করতে পার। আয়াতের কথাগুলো হল এইঃ

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِنِيْنَ

অর্থাৎ, আপনার যদি কোন চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা হয়, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকে এমনভাবে ফিরিয়ে দেবেন যেন আপনারা এবং তারা সমান সমান হয়ে যান। কারণ, আল্লাহ্ খেয়ানতকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

অর্থাৎ, যে জাতির সাথে কোন সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে, তার মোকাবেলায় কোন রকম সামরিক পদক্ষেপ খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ্ খেয়ানতকারীদেরকে পছন্দ করেন না। যদি এ খেয়ানত কাফের শত্রুর সাথেও করা হয়, তবুও তা জায়েয নয়। অবশ্য যদি অপরপক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, তবে এমনটি করা যেতে পারে যে, তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণার মাধ্যমে অবহিত করে দেবেন যে, আগামীতে আমরা এ চুক্তির বাধ্য থাকব না। কিন্তু ঘোষণাটি এমনভাবে হতে হবে যেন মুসলমান ও অপরপক্ষ এতে সমান সমান হয়। অর্থাৎ, এমন অবস্থা যেন সৃষ্টি করা না হয় যে, এই ঘোষণা ও সতর্ককীকরণের পূর্ব থেকেই তদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিয়ে নেবে এবং তারা চিন্তামুক্ত হয়ে থাকার দরুন প্রস্তুতি নিতে পারবে না। বরং যদি কোন প্রস্তুতি নিতে হয়, তা এই ঘোষণা ও সতর্কীকরণের পরেই নেবেন।

চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) প্রমুখ সুলায়ম ইবনে 'আমের এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, নির্দিষ্ট এক সময়ের জন্য হযরত মো'আবিয়া (রাঃ) এবং কোন এক সম্প্রদায়ের সাথে এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি ছিল। হযরত মো'আবিয়া (রাঃ) ইচ্ছা করলেন যে, এই চুক্তির দিনগুলোতে নিজেদের সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সে সম্প্রদায়ের কাছাকাছি নিয়ে রাখবেন, যাতে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। কিন্তু ঠিক যখন হযরত মো'আবিয়ার সৈন্য দল সেদিকে রওয়ানা হচ্ছিল, দেখা গেল, একজন বুড়ো লোক ঘোড়ায় চড়ে খুব উচ্চৈঃস্বরে না'রা, লাগিয়ে আসছেন যে, الله اكبر الله اكبر وفاء لا غدرا অর্থাৎ, না'রায়ে তকবীরের সাথে তিনি বললেন, সম্পাদিত চুক্তি পূরণ করা কর্তব্য। এর বিরুদ্ধাচারণ করা উচিৎ নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন যে, কোন জাতি-সম্প্রদায়ের সাথে কোন সন্ধি বা যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেলে, তার বিরুদ্ধে কোন গিঠ খোলা অথবা বাঁধাও উচিত নয়। যাহোক, হযরত মো'আবিয়াকে বিষয়টি জানানো হলো। দেখা গেল কথাগুলো যিনি বলেছেন, তিনি হলেন সাহাবী হযরত আমর ইবনে আম্বাসাহ্ (রাঃ)। হযরত মো'আবিয়া ততক্ষণাৎ স্বীয় বাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যাতে যুদ্ধবিরতির মেয়াদে সৈন্য স্থাপনার পদক্ষেপের দরুন খেয়ানতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না পড়েন।—(ইবনে কাসীর)

উল্লেখিত আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম আয়াতে সে সমস্ত কাফেরের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি বলে বেঁচে গেছে কিংবা অংশ নিয়েও পালিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা যেন এমন ধারণা না করে যে, বাস্তবিক পক্ষেই আমরা বেঁচে গেছি। কারণ, বদরেরযু দ্ধটি কাফেরদের জন্য এক খোদায়ী আযাব। এই পাকড়াও থেকে বেঁচে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং বলা হয়েছে— اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ অর্থাৎ, এরা নিজেদের চতুরতার দ্বারা আল্লাহ্কে অপারক করতে পারবে না, তিনি যখনই ওদেরকে ধরতে চাইবেন, তখন এরা এক পা'ও সরতে পারবে না। হয়তো বা পৃথিবীতেই এরা ধরা পড়ে যেতে পারে, না হয় আখেরাতে তো তাদের আটকে পড়া অবধারিত।

এ আয়াত ইঙ্গিত করে দিচ্ছে যে, কোন অপরাধী পাপী যদি কোন বিপদ ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যায় এবং তারপরেও যদি তওবা না করে বরং স্বীয় অপরাধে অটল-অবিচল থাকে, তবে তাকে এর লক্ষণ মনে করো না যে, সে কৃতকার্য হয়ে গেছে এবং চিরকালের জন্যেই মুক্তি পেয়ে গেছে, বরং সে সর্বক্ষণই আল্লাহ্র হাতের মুঠোয় রয়েছে এবং এই অব্যাহতি তার বিপদকে আরো বাড়াচ্ছে যদিও সে তা অনুভব করতে পারছে না।

জেহাদের জন্য যুদ্ধোপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা ফরয ঃ পরবর্তী আয়াতে ইসলামের শত্রুকে প্রতিরোধ ও কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুতির বিধান বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে- وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ অর্থাৎ, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ তৈরী করে নাও যতটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব। এক্ষেত্রে যুদ্ধোপকরণ তৈরী করার সাথে مَّا اسْتَطَعْتُمْ -এর শর্ত আরোপ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমাদের সফলতা লাভের জন্য এটা অপরিহার্য নয় যে, তোমাদের প্রতিপক্ষের নিকট যে ধরনের এবং যে পরিমাণ উপকরণ রয়েছে তোমাদেরকেও ততটাই অর্জন করতে হবে বরং সামর্থ্য অনুযায়ী যা কিছু উপকরণ জোগাড় করতে পার তাই সংগ্রহ করে নাও, তবে সেটুকুই যথেষ্ট—আল্লাহ্র সাহায্য ও সহায়তা তোমদের সঙ্গে থাকবে।

অতঃপর সে উপকরণের কিছুটা বিশ্লেষণ এভাবে করা হয়েছে مِّنْ قُوَّةٍ অর্থাৎ, মোকাবেলা করার শক্তি সঞ্চয় কর। এতে সমস্ত যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত এবং শরীরচর্চা ও সমর বিদ্যা শিক্ষা করারও অন্তর্ভুক্ত। কোরআন করীম এখানে তৎকালে প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রের কোন উল্লেখ করেনি, বরং ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'শক্তি' ব্যবহার করে ইঙ্গিত দিয়েছে, 'শক্তি' প্রত্যেক যুগ, দেশ ও স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হতে পারে। তৎকালীন সময়ের অস্ত্র ছিল তীর-তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি। তারপরে বন্দুক-তোপের যুগ এসেছে। তারপর এখন চলছে বোমা, রকেটের যুগ। 'শক্তি' শব্দটি এ সবকিছুতেই ব্যাপক। সুতরাং যে কোন বিদ্যা ও কৌশল শিক্ষা করার প্রয়োজন হবে সেসবই যদি এই নিয়তে হয় যে, তার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুকে প্রতিহত করা এবং কাফেরদের মোকাবেলা করা হবে, তাহলে তাও জেহাদেরই শামিল।

বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করা এবং সেগুলো ব্যবহার করার কায়দা-কৌশল অনুশীলন করাকে বিরাট এবাদত ও মহাপুণ্য লাভের উপায় বলে সবাস্ত্য করেছেন।

আর জেহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেহেতু ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিরক্ষা এবং প্রতিরক্ষার বিষয়টি সর্বযুগে ও সব জাতিতে আলাদা রকম, সেহেতু রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন— "মুশরেকীনদের বিরুদ্ধে জান-মাল ও মুখে জেহাদ কর।"— (আবু দাউদ, নাসায়ী)

এ হাদীসের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, জেহাদ ও প্রতিরোধ যেমন অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তেমনি কোন কোন সময় মুখেও হয়ে থাকে। তাছাড়া কলমও মুখেরই পর্যায়ভুক্ত। ইসলাম ও কোরআনের বিরুদ্ধে কাফের ও মুলহেদদের আক্রমণ এবং তার বিকৃতি সাধনের প্রতিরোধ মুখে কিংবা কলমের দ্বারা করাও এই সুস্পষ্ট নির্দেশেরভিত্তিতে জেহাদের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখিত আয়াতে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করার নির্দেশ দানের পর সেসব সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করার ফায়দা এবং আসল উদ্দেশ্যও এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে– تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ অর্থাৎ, যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য যুদ্ধ–বিগ্রহ করা নয়, বরং কুফর ও শিরককে পরাভূত ও প্রভাবিত করে দেয়া। তা কখনো মুখ ও কলমের মাধ্যমেও হতে পারে। আবার অনেক সময় যুদ্ধেরও প্রয়োজন হয়। কাজেই পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিরোধ করা ফরয।

অতঃপর বলা হয়েছে, যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে যাদেরকে প্রভাবিত করা উদ্দেশ্য তাদের অনেককে মুসলমানরা জানে। আর তারা হল সেসব লোক যাদের সাথে মুসলমানদের মোকাবেলা চলছে। এ ছাড়াও কিছু লোক রয়েছে যাদেরকে এখনও মুসলমানরা জানে না। এর মর্ম হল সারা দুনিয়ার কাফের ও মুশরিক, যারা এখনও মুসলমানদের মুকাবেলায় আসেনি কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের সাথেও সংঘর্ষ বাধতে পারে। কোরআন করীমের এ আয়াতটিতে বলে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ যদি নিজেদের উপস্থিত শত্রুর মোকাবেলার প্রস্তুতি নেয়, তবে এর প্রভাব শুধু সে শত্রুর উপরই পড়বে না, বরং দূরদূরান্তের কাফের শক্তির উপরেও পড়বে। বস্তুতঃ হয়েছেও তাই। খোলাফায়ে–রাশেদীনের আমলে এরা সবাই পরাজিত ও প্রভাবিত হয়ে যায়।

যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থেরও প্রয়োজন হয়; বরং যুদ্ধের সাজ–সরঞ্জাম অর্থ–সম্পদের দ্বারাই তৈরী করা যেতে পারে। সেজন্যই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্‌র রাহে মাল বা অর্থ–সম্পদ ব্যয় করার ফযীলত এবং তার মহা–প্রতিদানের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে যে, এ পথে তোমরা যাই কিছু ব্যয় করবে তার বদলা পুরোপুরিভাবে তোমাদেরকে দেয়া হবে। কোন কোন সময় দুনিয়াতেই গনীমতের মালের আকারে এ বদলা মিলে যায়, না হয় আখেরাতের বদলা তো নির্ধারিত রয়েছেই। বলাবাহুল্য, সেটিই অধিকতর মূল্যবান।

তৃতীয় আয়াতে সন্ধির বিধি–বিধান এবং সে সম্পর্কিত বর্ণনা। বলা হয়েছে وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا – سلم সীন বর্ণের উপর যবর (َ) এবং سلم সীন বর্ণের নীচে যের (ِ) উভয় উচ্চারণেই শব্দটি সন্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যদি কাফেরা কোন সময় সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে আপনারও তাই করা উচিত। এখানে নির্দেশবাচক পদ উত্তমতা বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মর্মার্থ এই যে, কাফেরা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে সেক্ষেত্রে আপনার এ অধিকার রয়েছে যে সন্ধি করায় যদি মুসলমানদের কল্যাণ মনে করেন, তাহলে সন্ধিও করতে পারেন।

আর وَإِنْ جَنَحُوا –এর শর্ত আরোপ করাতে বোঝা যাচ্ছে, সন্ধি তখনই করা যেতে পারে, যখন কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশ পাবে। কারণ, তাদের আগ্রহ ব্যতীত যদি স্বয়ং মুসলমানগণ সন্ধির উদ্যোগ করে, তবে এতে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। তবে যদি এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, মুসলমানগণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নিজেদের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য একমাত্র সন্ধি ছাড়া অন্য কোন পন্থা দেখা না যায়, তবে সেক্ষেত্রে ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদদের মতে সন্ধির উদ্যোগ করাও জায়েয।

আর যদি শত্রুদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশে এমন কোন সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে যে, তারা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে, শৈথিল্যে ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করে বসবে, সেজন্য আয়াতের শেষাংশে রসূলে করীম (সাঃ)–কে হেদায়েত দান করা হয়েছে যে, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ অর্থাৎ, আপনি আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসা করুন। কারণ, তিনিই যথার্থ শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। তিনি তাদের কথাবার্তাও শোনেন এবং তাদের মনের গোপন ইচ্ছাও জানেন। তিনি আপনার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। কাজেই আপনি এহেন প্রমাণহীন আশঙ্কা–সম্ভাবনার উপর নিজ কাজের ভিত রাখবেন না। এসব আশঙ্কার বিষয়গুলো আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিন।

পরবর্তী আয়াতে বিষয়টিকে আরো কিছুটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ‘‘এ সম্ভাবনাই যদি বাস্তবায়িত হয়ে যায়, সন্ধি করতে গিয়ে তাদের নিয়ত যদি খারাপ থাকে এবং আপনাকে যদি এভাবে ধোঁকা দিতে চায়, তবুও আপনি কোন পরোয়া করবেন না। আল্লাহ্ তাআলাই আপনার জন্য যথেষ্ট। পূর্বেও আল্লাহ্‌র সাহায্য–সমর্থনেই আপনার ও মুমিনদের কার্যসিদ্ধি হয়েছে।’’ তিনি তাঁর বিশেষ সাহায্যে আপনার সহায়তা করেছেন, যা আপনার বিজয় ও কৃতকার্যতার ভিত্তি ও বাস্তব সত্য। আবার বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের জামাতকে আপনার সাহায্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যা ছিল বাহ্যিক উপকরণ। সুতরাং যিনি প্রকৃত মালিক ও মহাশক্তিমান, যিনি বিজয় ও কৃতকার্যতার যাবতীয় উপকরণকে বাস্তবতায় রূপায়িত করেছেন, তিনি আজও শত্রুদের ধোঁকা–প্রতারণার ব্যাপারে আপনার সাহায্য করবেন।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ۭ هُوَ الَّذِيْٓ
اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝٦٢ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ۭ لَوْ اَنْفَقْتَ
مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ
اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝٦٣ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَ
مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٦٤ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ
عَلَى الْقِتَالِ ۭ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا
مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ۝٦٥ اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ
وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ۭ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا
مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَ
اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝٦٦ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰي حَتّٰي
يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ ۭ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ
الْاٰخِرَةَ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝٦٧ لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ
لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝٦٨ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ
حَلٰلًا طَيِّبًا ۡ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٦٩ ع

(৬২) পক্ষান্তরে তারা যদি তোমাকে প্রতারণা করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনিই তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুসলমানদের মাধ্যমে। (৬৩) আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে। যদি তুমি সেসব কিছু ব্যয় করে ফেলতে, যা কিছু যমীনের বুকে রয়েছে, তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, সুকৌশলী। (৬৪) হে নবী, আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য আল্লাহ্ যথেষ্ট। (৬৫) হে নবী, আপনি মুসলমানগণকে উৎসাহিত করুন জেহাদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে এক শ' লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর থেকে তার কারণ, ওরা জ্ঞানহীন। (৬৬) এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত একশ' লোক বিদ্যমান থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর উপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দু'হাজারের উপর। আর আল্লাহ্ রয়েছেন দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে। (৬৭) নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ্ চান আখেরাত। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা। (৬৮) যদি একটি বিষয় না হত যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ সে জন্য বিরাট আযাব এসে পৌছাত। (৬৯) সুতরাং তোমরা খাও গনীমত হিসাবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলমানদের পারস্পরিক স্থায়ী ঐক্য ও সম্প্রীতির প্রকৃত ভিত্তি : এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের অন্তরে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হওয়া আল্লাহ্ তাআলার দান। তাছাড়া এতে একথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তাআলার না-ফরমানীর মাধ্যমে তাঁর দান অর্জন করা সম্ভব নয়, বরং তাঁর দান লাভের জন্য তার আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা একান্ত শর্ত।

দল বা ব্যক্তিবর্গের মাঝে একতা ও ঐকমত্য এমন একটি বিষয় যার উপকারিতা ও প্রশংসনীয় হওয়ার ব্যাপারে কোন মযহাব ও ধর্ম, কিংবা কোন মতবাদেই কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। সেজন্যই এমন প্রতিটি লোক, যে মানুষের সংশোধন ও সংস্কার কামনা করে সে তাদের পরস্পরের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির উপর জোর দিয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ পৃথিবী এ বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত নয় যে, দীর্ঘস্থায়ী ও আন্তরিক ঐক্য বাহ্যিক প্রচেষ্টার দ্বারা অর্জিত হয় না। একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি বিধান ও আনুগত্যের মাধ্যমেই তা অর্জিত হতে পারে। কোরআন হাকীম এই বাস্তবতার প্রতিই কয়েকটি আয়াতে ইঙ্গিত করেছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا এই আয়াতে মতবিরোধ ও অনৈক্য থেকে বাঁচার পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে যে, সবাই মিলে আল্লাহ্র রজ্জুকে অর্থাৎ, কোরআন তথা ইসলামী শরীয়তকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। তাহলে সবাই আপনা থেকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে এবং পারস্পরিক যেসব বিরোধ রয়েছে, তা মিটে যাবে। অবশ্য মতের পার্থক্য থাকা পৃথক জিনিস; যতক্ষণ পর্যন্ত এ পার্থক্য তার সীমায় থাকে, ততক্ষণ তা বিবাদ-বিসংবাদ ও বিভেদের কারণ হতে পারে না। ঝগড়া-বিবাদ তখনই হয়, যখন শরীয়ত নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘিত হয়।

আয়াতের শেষভাগে সাধারণ নীতি আকারে বলা হয়েছে : وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে রয়েছেন। এতে যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়তা অবলম্বনকারীও অন্তর্ভুক্ত এবং শরীয়তের সাধারণ হুকুম-আহ্কামের অনুবর্তিতায় দৃঢ়তা অবলম্বনকারীরাও শামিল। তাদের সবার জন্যই আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গদানের এ প্রতিশ্রুতি। আর এই খোদায়ী সঙ্গই প্রকৃতপক্ষে তাদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের মূল রহস্য। কারণ, যে ব্যক্তি একক ক্ষমতার অধিকারী পরওয়ারদেগারের সঙ্গলাভে সমর্থ হয়, তাকে সারা বিশ্বের সমবেত শক্তিও নিজের জায়গা থেকে এক বিন্দু নাড়াতে পারে না।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ .... আয়াতটি গযওয়ায়ে বদরের বিশেষ এক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বিধায় এগুলোর তফসীর করার পূর্বে বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য রেওয়ায়েত ও হাদীসের মাধ্যমে ঘটনাটি বিবৃত করা বাঞ্ছনীয়।

ঘটনাটি হল এই যে, বদর যুদ্ধটি ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম জেহাদ যা একান্তই দৈবাৎ সংঘটিত হয়। তখনও জেহাদ সংক্রান্ত হুকুম-আহ্কামের কোন বিস্তারিত বিবরণ কোরআনে অবতীর্ণ হয়নি। যেমন, জেহাদ করতে গিয়ে গনীমতের মাল হস্তগত হলে তা কি করতে হবে, শত্রু-সৈন্য নিজেদের আয়ত্বে এসে গেলে, তাকে বন্দী করা জায়েয হবে কিনা এবং বন্দী করে ফেললে তাদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে প্রভৃতি।

সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূল

করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি। সেগুলোর মাঝে এও একটি যে, কাফেরদের থেকে প্রাপ্ত গনীমতের মালামাল কারো জন্য হালাল ছিল না, কিন্তু আমার উম্মতের জন্য তা হালাল করে দেয়া হয়েছে। গনীমতের মাল বিশেষভাবে এ উম্মতের জন্য হালাল হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্র তো জানা ছিল, কিন্তু গযওয়ায়ে বদরের পূর্ব পর্যন্ত এর হালাল হওয়ার ব্যাপারে মহানবী (সাঃ)–এর উপর কোন ওহী নাযিল হয়নি। অথচ গযওয়ায়ে বদরে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানগণকে ধারণা–কল্পনার বাইরে অসাধারণ বিজয় দান করেন। শত্রুরা বহু মালামালও ফেলে যায়, যা গনীমত হিসাবে মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং তাদের বড় বড় সত্তর জন সর্দারও মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে আসে। কিন্তু এতদুভয় বিষয়ের বৈধতা সম্পর্কে কোন ওহী তখনওআসেনি।

সে কারণেই সাহাবায়ে কেরামের প্রতি এহেন তড়িৎ পদক্ষেপের দরুন ভর্ৎসনা অবতীর্ণ হয়। এই ভর্ৎসনা ও অসন্তুষ্টিই এই ওহীর মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যাতে যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে বাহ্যতঃ দুটি অধিকার মুসলমানগণকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এরই মাঝে এই ইঙ্গিতও করা হয়েছিল যে, বিষয়টির দুটি দিকের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার নিকট একটি পছন্দনীয় এবং অপরটি অপছন্দীয়। তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, সহীহ ইবনে হাব্বান প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ)–এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ সময় হযরত জিব্রাঈলে–আমীন রসূলে করীম (সাঃ)–এর নিকট আগমন করে তাঁকে আল্লাহ্র এ নির্দেশ শোনান যে, আপনি সাহাবায়ে কেরামকে দুটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার দান করুন। তার একটি হলো এই যে, এই যুদ্ধবন্দীদিগকে হত্যা করে শত্রুর মনোবলকে চিরতরে ভেঙ্গে দেবে। আর দ্বিতীয়টি হলো এই যে, তাদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেবে। তবে দ্বিতীয় অবস্থায়, আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশক্রমে একথা অবধারিত হয়ে রয়েছে যে এর বদলা হিসাবে আগামী বছর মুসলমানদের এমনি সংখ্যক লোক শহীদ হবেন, যে সংখ্যক বন্দী আজ মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হবে। এভাবে যদিও ক্ষমতা দেয়া হয় এবং সাহাবায়ে কেরামকে এ দুটি থেকে একটি বেছে নেয়ার অধিকার দেয়া হয় কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় সত্তর জন সাহাবার শাহাদাতের ফয়সালার বিষয় উল্লেখ করার মাঝে অবশ্যই এই ইঙ্গিত বিদ্যমান ছিল যে, এ দিকটি আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয় নয়। কারণ, এটি যদি পছন্দই হত, তবে এর ফলে সত্তর জন মুসলমানের খুন অবধারিত হতো না।

সাহাবায়ে কেরামের সামনে এ দুটি বিষয় যখন ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পেশ করা হল যে, এদেরকে যদি মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে হয়তো এরা সবাই অথবা এদের কেউ কেউ কোন সময় মুসলমান হয়ে যাবে। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই হল জেহাদের উদ্দেশ্য ও মূল উপকারিতা। দ্বিতীয়তঃ এমনও ধারণা করা হয়েছিল যে, এ সময় মুসলমানগণ যখন নিদারুণ দৈন্যাবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, তখন সত্তর জনের আর্থিক মুক্তিপণ অর্জিত হলে এ কষ্টও কিছুটা লাঘব হতে পারে এবং তা ভবিষ্যতে জেহাদের প্রস্তুতির জন্যও সহায়ক হতে পারে। রইল সত্তর জন মুসলমানের শাহাদতের বিষয়! প্রকৃতপক্ষে এটাও একটা বিপুল গৌরবের বিষয়। এতে ঘাবড়ানো উচিত নয়। এসব ধারণার প্রেক্ষিতে সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ও অন্যান্য অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম এ মতই প্রদান করলেন যে, বন্দিগণকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেয়া হোক। শুধুমাত্র হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ও হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) প্রমুখ কয়েকজন এ মতের বিরোধিতা করলেন এবং বন্দীদের সবাইকে হত্যা করার পক্ষে মত দান করলেন। তাদের যুক্তি ছিল এই যে, একান্ত সৌভাগ্যক্রমে ইসলামের মোকাবেলায় শক্তি ও সামর্থ্যের বলে যোগদানকারী সমস্ত কোরায়েশ সর্দার এখন মুসলমানদের হস্তগত হলেও পরে তাদের ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি একান্তই কল্পনানির্ভর। কিন্তু ফিরে গিয়ে এরা যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করবে সে ধারণাই প্রবল।

রসূলে করীম (সাঃ) যিনি রাহমাতুললিল আলামীন হয়ে আগমন করেছিলেন এবং আপাদমস্তক করুণার আধার ছিলেন, তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে দুটি মত লক্ষ্য করে সে মতটিই গ্রহণ করে নিলেন, যাতে বন্দীদের ব্যাপারে রহ্মত ও করুণা প্রকাশ পাচ্ছিল এবং বন্দীদের জন্যও ছিল সহজ। অর্থাৎ, মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া। তিনি ছিদ্দীকে আকবর ও ফারূকে আযম (রাঃ)–কে উদ্দেশ করে বললেন لواتفقتما ما خالفتكما অর্থাৎ, তোমরা উভয়ে যদি কোন বিষয়ে একমত হয়ে যেতে, তবে আমি তোমাদের বিরোধিতা করতাম না। (মাযহারী) তাঁদের মত–বিরোধের ক্ষেত্রে বন্দীদের প্রতি সহজতা প্রদর্শন করাই ছিল সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়া ও করুণার তাকাদা। অতএব, তাই হল। আর তারই পরিণতিতে পরবর্তী বছর খোদায়ী বাণী মোতাবেক সত্তর জন মুসলমানের শাহাদতের ঘটনা সংঘটিত হল।

تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا আয়াতে সে সমস্ত সাহাবাকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার রসূলকে অসংগত পরামর্শ দান করছো। কারণ, শত্রুদেরকে বশে পাওয়ার পরেও তাদের শক্তি ও দম্ভকে চূর্ণ করে না দিয়ে অনিষ্টকর শত্রুকে ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের জন্য স্থায়ী বিপদ দাঁড় করিয়ে দেয়া কোন নবীর পক্ষেই শোভন নয়।

এ আয়াতে حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে اثخان এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কারও শক্তি ও দম্ভকে ভেঙ্গে দিতে গিয়ে কঠোরতর ব্যবস্থা নেয়া। এ অর্থের তাকীদ বোঝাবার জন্য فِي الْأَرْضِ বাক্যের প্রয়োগ। এর সারার্থ হল এই যে, শত্রুর দম্ভকে ধূলিস্মাৎ করে দেন।

যেসব সাহাবী মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন, তাঁদের সে মতে যদিও নির্ভেজাল একটি দ্বীনী প্রেরণাও বিদ্যমান ছিল—অর্থাৎ, মুক্তি পাবার পর তাদের মুসলমান হয়ে যাবার আশা, কিন্তু সেই সাথে আত্মস্বার্থজনিত অপর একটি দিকও ছিল যে, এতে করে তাদের হাতে কিছু অর্থ–সম্পদ এসে যাবে। অথচ তখনও পর্যন্ত কোন সরাসরি 'নছ' বা খোদায়ী বাণীর মাধ্যমে সে সমস্ত মালামালের বৈধতা প্রমাণিত ছিল না। কাজেই মানুষের যে সমাজটিকে রসূলে করীম (সাঃ)–এর তত্ত্বাবধানে এমন মানদন্ডের গঠন করা হচ্ছিল, যাতে তাদের মর্যাদা ফেরেশতাদের চেয়েও বেশী হবে, তাদের পক্ষে গনীমতের সে মাল–সামান বা দ্রব্য সামগ্রীর আগ্রহকেও এক রকম পাপ বলে গণ্য করা হয়। তাছাড়া যে কাজে বৈধাবৈধের সমন্বয় থাকে, তার সমষ্টিকে অবৈধ বলেই বিবেচনা করা হয়। সে জন্যই সাহাবায়ে কেরামের সে কাজটিকে ভর্ৎসনাযোগ্য সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে ঃ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّمَنْ فِىْۤ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰۤى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ
قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّاۤ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ۝٧٠ وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ
فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٧١ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا
وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا
وَّنَصَرُوْۤا اُولٰۤئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ
وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ ۭ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٧٢ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ۝٧٣ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْۤا اُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ
حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٧٤ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ
وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰۤئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝٧٥

(৭০) হে নবী, তাদেরকে বলে দাও, যারা তোমার হাতে বন্দী হয়ে আছে যে, আল্লাহ্ যদি তোমাদের অন্তরে কোন রকম মঙ্গলচিন্তা রয়েছে বলে জানেন, তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে বিনিময়ে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৭১) আর যদি তারা তোমার সাথে প্রতারণা করতে চায়—বস্তুতঃ তারা আল্লাহ্র সাথেও ইতিপূর্বে প্রতারণা করেছে, অতঃপর তিনি তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত, সুকৌশলী। (৭২) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ্র রাহে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছে, তারা একে অপরের সহায়ক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু দিশত্যাগ করেনি তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগ করে। অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী-চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ সেসবই দেখেন। (৭৩) আর যারা কাফের তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে। (৭৪) আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং আল্লাহ্র রাহে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে, তাঁরাই হলো সত্যিকার মুসলমান। তাঁদের জন্যে রয়েছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী। (৭৫) আর যারা ঈমান এনেছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং তোমাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে জেহাদ করেছে, তারাও তোমাদেরই অর্ন্তভুক্ত। বস্তুতঃ যারা আত্মীয়, আল্লাহ্র বিধান মতে তারা পরস্পর বেশী হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাবতীয় বিষয়ে সক্ষম ও অবগত।

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ, তোমরা দুনিয়া কামনা কর অথচ তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্ চান, তোমরা যেন আখেরাত কামনা কর। এখানে ভর্ৎসনা হিসাবে শুধুমাত্র তাদের সে কাজের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে যা ছিল অসন্তুষ্টির কারণ। বন্দীদের মুসলমান হওয়ার আশা সংক্রান্ত দ্বিতীয় কারণটির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের মত নিঃস্বার্থ, পবিত্রাত্মা দলের পক্ষে এমন দ্ব্যর্থবোধক নিয়ত করা, যাতে কিছু পার্থিব স্বার্থও নিহিত থাকবে গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে ভর্ৎসনা ও সতর্কীকরণের লক্ষ্যস্থল হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। যদিও রসূলে করীম (সাঃ) নিজেও তাঁদের মতামত সমর্থন করে তাদের সাথে আংশিকভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সে কাজটি ছিল একান্তভাবেই তাঁর রাহ্মাতুললিল আলামীন বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ। সে কারণেই তিনি মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সে দিকটিই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, যা বন্দীদের পক্ষে সহজ ও দয়াভিত্তিক।

আয়াতের শেষাংশে وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা মহাপরাক্রমশীল, হেকমতওয়ালা; আপনারা যদি তাড়াহুড়া না করতেন, তবে তিনি স্বীয় অনুগ্রহে পরবর্তী বিজয়ে আপনাদের জন্য ধন-সম্পদের ব্যবস্থাও করে দিতেন।

মাসআলা ঃ উল্লেখিত আয়াতে মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তিদান ও গনীমতে মালামাল সংগ্রহের কারণে ভর্ৎসনা নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ্র আযাবের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং পরে তা ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এতে ভবিষ্যতে এসমস্ত ব্যাপারে মুসলমানদিগকে কোন্ পন্থা অবলম্বন করতে হবে, তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। সে কারণেই পরবর্তী আয়াতে গনীমতের মালামাল সংক্রান্ত মাসআলাটি পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে — فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ অর্থাৎ, গনীমতের যে সব মালামাল তোমাদের হস্তগত হবে, এখন থেকে সেগুলো তোমরা খেতে পারবে এবং ভবিষ্যতের জন্যও তা হালাল করে দেয়া হল। কিন্তু তার পরেও এতে একটি সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় যে, গনীমতের মাল হালাল হওয়ার নির্দেশটি তো এখন হলো; কিন্তু ইতিপূর্বে যেসব মালামাল সংগ্রহ করে নেয়া হয়েছিল হয়তো সেগুলোতে কোন রকম কারাহাত বা দোষ থাকতে পারে। সেইজন্যই এর পর حَلٰلًا طَيِّبًا বলে সে সন্দেহের অপনোদন করা হয়েছে যে, যদিও বৈধতার হুকুম নাযিল হওয়ার প্রাক্কালে গনীমতের মাল সংগ্রহের পদক্ষেপ নেয়া জায়েয ছিল না, কিন্তু এখন যখন গনীমতের মালের বৈধতা সংক্রান্ত হুকুম এসে গেছে, তখন সংগৃহীত মালামালও নির্দোষভাবেই হালাল।

মাসআলা ঃ এখানে উসূলে ফেকাহ্র একটি বিষয় লক্ষণীয় ও প্রণিধানযোগ্য। তা হল এই যে, যখন কোন অবৈধ পদক্ষেপের পর স্বয়ং কোন আয়াতের মাধ্যমে সে বিষয়টিকে হালাল করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, তখন তাতে পূর্ববর্তী পদক্ষেপের কোনই প্রভাব থাকে না; সে মালামাল যথার্থভাবেই পবিত্র ও হালাল হয়ে যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গয্ওয়ায়ে বদরের বন্দীদিগকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। ইসলাম ও মুসলমাদের সে শত্রু যারা তাদেরকে কষ্ট দিতে, মারতে এবং হত্যা করতে কখনই কোন ত্রুটি করেনি; যখনই কোন রকম সুযোগ পেয়েছে একান্ত নির্দয়ভাবে অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছে, মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে আসার পর এহেন শত্রুদেরকে প্রাণে বাঁচিয়ে দেয়াটা সাধারণ ব্যাপার

ছিল না; এটা ছিল তাদের জন্য বিরাট প্রাপ্তি এবং অসাধারণ দয়া ও করুণা। পক্ষান্তরে মুক্তিপণ হিসাবে তাদের কাছ থেকে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছিল, তাও ছিল অতি সাধারণ।

এটা আল্লাহ্ তাআলার একান্ত মেহেরবাণী ও দয়া যে, এই সাধারণ অর্থ পরিশোধ করতে গিয়ে যে কষ্ট তাদের করতে হয়, তাও তিনি কি চমৎকারভাবে দূর করে দিয়েছেন। উল্লেখিত আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা যদি তোমাদের মন–মানসিকতায় কোন রকম কল্যাণ দেখতে পান, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু নেয়া হয়েছে, তার চেয়ে উত্তম বস্তু তোমাদের দিয়ে দেবেন। তদুপরি তোমাদের অতীত পাপও তিনি ক্ষমা করে দেবেন। এখানে خَيْرًا অর্থ ঈমান ও নিষ্ঠা। অর্থাৎ, মুক্তি লাভের পর সেসব বন্দীদের মধ্যে যারা পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা যে মুক্তিপণ দিয়েছে, তার চাইতে অধিক ও উত্তম বস্তু পেয়ে যাবে। বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয়ার সাথে সাথে তাদেরককে এমনভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, তারা যেন মুক্তি লাভের পর নিজেদের লাভ–ক্ষতির প্রতি মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে। সুতরাং বাস্তব ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, তাদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছিলেন, আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে ক্ষমা এবং জান্নাতে সুউচ্চ স্থান দান ছাড়াও পার্থিব জীবনে এত অধিক পরিমাণ ধন–সম্পদ দান করেছিলেন, যা তাদের দেয়া মুক্তিপণ অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম ও অধিক ছিল।

অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেছেন যে, এ আয়াতটি মহানবী (সাঃ)–এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ, তিনিও বদরের যুদ্ধবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেও মুক্তিপণ নেয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, মক্কা থেকে তিনি যখন বদর যুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন কাফের সৈন্যদের জন্য ব্যয় করার উদ্দেশে প্রায় সাতশ' স্বর্ণমুদ্রা সাথে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো ব্যয় করার পূর্বেই তিনি গ্রেফতার হয়ে যান।

যখন মুক্তিপণ দেয়ার সময় আসে, তখন তিনি হুযুর আকরাম (সাঃ)–এর নিকট নিবেদন করলেন, আমার কাছে যে স্বর্ণ ছিল সেগুলোকেই আমার মুক্তিপণ হিসাবে গণ্য করা হোক। হুযুর (সাঃ) বললেন, যে সম্পদ আপনি কুফরীর সাহায্যের উদ্দেশে নিয়ে এসেছিলেন, তা তো মুসলমাদের গনীমতের মালে পরিণত হয়ে গেছে, ফিদ্ইয়া বা মুক্তিপণ হতে হবে সেগুলো বাদে। সাথে সাথে তিনি একথাও বললেন যে, আপনার দুই ভাতিজা 'আকীল ইবনে–আবী তালেব এবং নওফল ইবনে হারেসের মুক্তিপণও আপনাকেই পরিশোধ করতে হবে। আব্বাস (রাঃ) নিবেদন করলেন, আমার উপর যদি এত অধিক পরিমাণে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়, তবে আমাকে কোরাইশদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হবে; আমি সম্পূর্ণভাবে ফকীর হয়ে যাব। মহানবী (সাঃ) বললেন, কেন, আপনার নিকট কি সে সম্পদগুলো নেই, যা আপনি মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে আপনার স্ত্রী উম্মুল ফয্লের নিকট রেখে এসেছেন? হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, আপনি সে কথা কেমন করে জানলেন? আমি যে রাত্রের অন্ধকারে একান্ত গোপনে সেগুলো আমার স্ত্রীর নিকট অর্পন করেছিলাম এবং এ ব্যাপারে তৃতীয় কোন লোকই অবগত নয়! হুযুর (সাঃ) বললেন, সে ব্যাপারে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে বিস্তারিত অবহিত করেছেন। একথা শুনেই হযরত আব্বাস (রাঃ)–এর মনে হুযুর (সাঃ)–এর নবুওয়তের সত্যতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায়। তাছাড়া এর আগেও তিনি মনে মনে হুযুর (সাঃ)–এর ভক্ত ছিলেন, কিন্তু কিছু সন্দেহও ছিল যা এ সময় আল্লাহ্ তাআলা দূর করে দেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি তখনই মুসলমান হয়ে যান। কিন্তু তিনি বহু টাকা–কড়ি মক্কার কোরাইশদের নিকট ঋণ হিসাবে প্রাপ্য ছিল। তিনি যদি তখনই তাঁর মুসলমান হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি প্রাকাশ্যে ঘোষণা করতেন, তবে সে টাকাগুলো মারা যেত। কাজেই তিনি তখনই তা ঘোষণা করলেন না। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)ও এ ব্যাপারে কারো কাছে কিছু প্রকাশ করলেন না। মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি মহানবী (সাঃ)–এর নিকট মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলে মহানবী (সাঃ) তাঁকে এ পরামর্শই দিলেন, যাতে তিনি এ মুহূর্তে হিজরত না করেন।

হযরত আব্বাস (রাঃ)–এর এ সমস্ত কথোপকথনের প্রেক্ষিতে রসূলে করীম (সাঃ) উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত খোদায়ী ওয়াদার বিষয়টিও তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, আপনি যদি মুসলমান হয়ে গিয়ে থাকেন এবং একান্ত নিষ্ঠাসহকারে ঈমান এনে থাকেন, তবে যেসব মালামাল আপনি মুক্তিপণ বাবদ খরচ করেছেন, আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেবেন। সুতরাং হযরত আবাস (রাঃ) ইসলাম প্রকাশের পর প্রায়ই বলে থাকতেন, আমি তো সে ওয়াদার বিকাশ বাস্তবতা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করছি। কারণ, আমার নিকট থেকে মুক্তিপণ বাবদ বিশ উকিয়া সোনা নেয়া হয়েছিল। অথচ এখন আমার বিশটি গোলাম (ক্রীতদাস) বিভিন্ন স্থানে আমার ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে এবং তাদের কারো ব্যবসায়ই বিশ হাজার দেরহাম থেকে কম নয়। তদুপরি হজ্বের সময় হাজীদের পানি খাওয়ানোর খেদমতটিও আমাকেই অর্পণ করা হয়েছে যা আমার নিকট এমন এক অমূল্য বিষয় যে, সমগ্র মক্কাবাসীর যাবতীয় ধন–সম্পদও এ তুলনায় তুচ্ছ বলে মনে হয়।

গয্ওয়ায়ে বদরের বন্দীদের মধ্যে কিছু লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের সম্পর্কে লোকদের মনে একটা খট্কা ছিল যে, হয়তো এরা মক্কায় ফিরে গিয়ে আবার ইসলাম থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং পরে আমাদের কোন না কোন ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত হবে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা এ খট্কাটি এভাবে দূর করে দিয়েছেন ঃ

وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অর্থাৎ, যদি আপনার সাথে খেয়ানত করার সংকল্পই তারা করে, তবে তাতে আপনার কোন ক্ষতিই সাধিত হবে না। এরা তো সেসব লোকই, যারা ইতিপূর্বে আল্লাহ্র সাথেও খেয়ানত করেছে। অর্থাৎ, সৃষ্টিলগ্নে আল্লাহ্ তাআলার রাব্বুল আলামীন তথা বিশ্বপালক হওয়ার ব্যাপারে যে অঙ্গীকার তারা করেছিল, পরবর্তীকালে তার বিরোধিতা করতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তাদের এই খেয়ানত তাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা অপদস্ত, পদদলিত, লাঞ্ছিত ও বন্দী হয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাআলা মনের গোপনতম রহস্য সম্পর্কেও অবহিত রয়েছেন । তিনি বড়ই সুকৌশলী, হেকমতওয়ালা। এখনও যদি তারা আপনার বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হয়, তবে আল্লাহ্র হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করে যাবেটা কোথায়? তিনি এমনিভাবে তাদেরকে পুনরায় গ্রেফতার করে ফেলবেন। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদেরকে একান্ত উৎসাহব্যাঞ্জক ভঙ্গিতে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল। আর আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সর্তক করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের পার্থিব ও পারত্রিক কল্যাণ শুধুমাত্র ইসলাম ও ঈমানের উপরই নির্ভরশীল।

এ পর্যন্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ, তাদের বন্দীদশা ও মুক্তিদান এবং তাদের সাথে সন্ধি-সমঝোতার বিধান সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল। পরবর্তী আয়াতসমূহে অর্থাৎ, সূরার শেষ পর্যন্ত এ প্রসঙ্গেই এক বিশেষ অধ্যায়ের আলোচনা ও তার বিধি-বিধান সংক্রান্ত কিছু বিশ্লেষণ বর্ণিত হয়েছে। আর সেগুলো হচ্ছে হিজরত সংক্রান্ত হুকুম-আহ্কাম। কারণ, কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করতে গিয়ে এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে পারে যে, মুসলমাদের হয়তো তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে না এবং তারাও সন্ধি করতে রাজী হবে না। এহেন নাযুক পরিস্থিতিতে মুসলমানদের পরিত্রাণ লাভের একমাত্র পথ হল হিজরত। অর্থাৎ, এ নগরী বা দেশ অন্য কোন নগরী বা জনপদে গিয়ে বসতি স্থাপন করা, যেখানে স্বাধীনভাবে ইসলামী হুকুম-আহ্কামের উপর আমল করা যাবে।

সূরা আন্ফালের শেষ চারিটি আয়াতে সে সমস্ত আহ্কাম বর্ণনাই প্রকৃত ও মূল উদ্দেশ্য যা মুসলমান মুহাজেরদের উত্তরাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে অমুহাজের মুসলমানও অমুসমানদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আলোচনাও এসে গেছে।

এসব বিধি-বিধান বা হুকুম-আহ্কামের সারমর্ম এই যে, যে সমস্ত লোকের উপর শরীয়তের বিধি-বিধান বর্তায় তারা প্রথমতঃ দু'ভাগে বিভক্ত ; মুসলমান ও কাফের। আবার মুসলমান তখনকার দৃষ্টিতে দু'রকম; (১) মুহাজের ; যারা হিযরত ফরয হওয়ার প্রেক্ষিতে মক্কা থেকে মদীনায় এসে অবস্থান করতে থাকেন। (২) যারা কোন বৈধ অসুবিধার দরুন কিংবা অন্য কোন কারণে মক্কাতেই থেকে যান।

পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক এ সবরকম লোকদের মাঝেই বিদ্যমান ছিল। কারণ, ইসলামের প্রাথমিক পূর্বে এমন হয়েছিল যে, পুত্র হয়তো মুসলমান হয়ে গেলেন কিন্তু পিতা কাফেরই রয়ে গেল, কিংবা পিতা মুসলমান হয়ে গেলেন কিন্তু পুত্র রয়ে গেল কাফের। তেমনিভাবে ভাই ভাতিজা ভাগ্নে, নানা-মামা প্রভৃতির অবস্থাও ছিল তাই। তদুপরি মুহাজের-অমুহাজের মুসলমানদের মধ্যে আত্মীয়তা থাকা তো বলাইবাহুল্য।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অসীম রহমত ও পরম কুশলতার দরুন মৃত ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত মাল-আসবাব তথা ধন-সম্পদের অধিকারী তারই নিকটবর্তী ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজনকে সাব্যস্ত করেছেন। অথচ যে যা কিছু এ পৃথিবীতে অর্জন করেছেন, প্রকৃতপক্ষে সে সমস্ত কিছুর মালিকানাই আল্লাহ্ তাআলার। তাঁর পক্ষ থেকে এগুলো সারা জীবন ব্যবহার করার জন্য, এগুলোর দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য মানুষকে অস্থায়ী মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং মানুষের মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সব কিছু আল্লাহ্ তাআলার অধিকারে চলিয়া যাওয়াটাই ছিল ন্যায় বিচার ও যুক্তিসম্মত। যার কার্যকররূপ ছিল ইসলামী বায়তুল মাল তথা সরকারী কোষাগারে জমা হয়ে যাওয়ার পর তদ্দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির লালন-পালন ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু এমনটি করতে গেলে একদিকে মানুষের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অনুভূতি আহত হত। তাছাড়া মানুষ যখন একথা জানত যে, মৃত্যুর পর আমার ধন-সম্পদ না পাবে আমার সন্তান-সন্ততি, না পাবে আমার পিতা-মাতা, আর নাইবা পাবে আমার স্ত্রী, তখন তার ফল দাঁড়াত এই যে, স্বভাবসিদ্ধভাবে কোন মানুষই স্বীয় মালামাল ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা করত না। শুধুমাত্র নিজের জীবন পর্যন্তই প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করত। তার বেশী কিছু করার জন্য কেউ এতটুকু যত্নবান হত না। বলাবাহুল্য, এতে সমগ্র মানবজাতি ও সমস্ত শহর-নগরীর উপর ধ্বংস ও বরবাদী নেমে আসত।

সে কারণেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে তার আত্মীয় স্বজনের অধিকার বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। বিশেষ করে এমন আত্মীয়-স্বজনের উপকারিতার লক্ষ্যে সে তার জীবনে ধন-সম্পদ অর্জন ও সঞ্চয় করত এবং নানা রকম কষ্ট পরিশ্রমে ব্রতী হত।

এরই সাথে সাথে ইসলাম যে অতি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যটির প্রতি মীরাসের বন্টন ব্যাপার লক্ষ্য রেখেছে, যার জন্য গোটা মানব জাতির সৃষ্টি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য ও এবাদত। এদিক দিয়ে সমগ্র মানব বিশ্বকে দু'টি পৃথক পৃথক জাতি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে; মুমিন ও কাফের। কোরআনে উল্লেখিত এ আয়াত خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ এর মর্মও তাই।

এই দ্বি-বিধ জাতীয়তার দর্শনই বংশ ও গোত্রগত সম্পর্কে মীরাসের পর্যায় পর্যন্ত বিচ্ছন্ন করে দিয়েছে। সুতরাং কোন মুসলমান কোন কাফের আত্মীয়ের মীরাসের কোন অংশ পাবে না এবং কোন কাফেরেরও অন্য কোন মুসলমান আত্মীয়ের মীরাসে কোন অধিকার থাকবে না। প্রথমোক্ত দু'টি আয়াতে এ বিষয়েরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ এ নির্দেশটি চিরস্থায়ী ও অরহিত। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামের এ উত্তরাধিকার নীতিই বলবৎ থাকবে।

এর সাথে মুসলমান মুহাজের ও আনসারদের মীরাস সংক্রান্ত অন্য একটি হুকুম রয়েছে, যার সম্পর্কে প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলমানগণ যতক্ষণ মক্কা থেকে হিজরত না করবে, হিজরতকারী মুসলমানদের সাথে তাদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন থাকবে। না কোন মুহাজের মুসলমান তার অমুহাজের মুসলমান আত্মীয়ের উত্তরাধিকারী হবে, না অমুহাজের কোন মুসলমান মুহাজের মুসলমানদের মীরাসের কোন অংশ পাবে। বলাবাহুল্য, এ নির্দেশটি তখন পর্যন্তই কার্যকর ছিল যতক্ষণ না মক্কা বিজয় হয়ে যায়। কারণ, মক্কা বিজয়ের পর স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ) ঘোষণা করে দেন, لا هجرة بعد الفتح অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের হুকুমটিই শেষ হয়ে গেছে। আর হিজরতের হুকুমই যখন শেষ হয়ে গেল, তখন যারা হিজরত করবে না, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের প্রশ্নটিও শেষ হয়ে যায়।

এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেছেন, এ হুকুমটি মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে অনুসন্ধানবিদদের মতে এ হুকুমটি চিরস্থায়ী ও গায়েব মনসূখ, কিন্তু এটি অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়েছে। যে পরিস্থিতিতে কোরআনের অবতরণকালে এ হুকুমটি নাযিল হয়েছিল, যদি কোন কালে কোন দেশে এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহলে সেখানেও এ হুকমুই প্রবর্তিত হবে।

বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর হিজরত করা 'ফরযে আইন' অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে হাতে গণা কতিপয় মুসলমান ছাড়া বাকী সব মুসলমানই হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছিলেন। তখন মক্কা থেকে হিজরত না করা এর লক্ষণ হয়ে গিয়েছিল যে, সে মুসলমান নয়। কাজেই অমুহাজেরদের ইসলামও তখন সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিল। সেজন্যই মুহাজের-অমুহাজেরদের উত্তরাধিকার স্বত্ব ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল।

এখন যদি কোন দেশে আবারও এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সেখানে বসবাস করে যদি ইসলামী ফরায়েয সম্পাদন করা আদৌ সম্ভব না হয়, তবে সে দেশ থেকে হিজরত করা পুনরায় ফরয হয়ে যাবে। আর এমন পরিস্থিতিতে অতি জটিল কোন ওযর ব্যতীত হিজরত না করা নিশ্চিতভাবে যদি কুফরীর লক্ষণ বলে গণ্য হয়, তবে আবারও এ হুকুমই আরোপিত হবে। মুহাজের ও অমুহাজেরের মাঝে পারস্পরিক উত্তরাধিকার স্বত্ব বজায় থাকবে না। এ বর্ণনাতে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুহাজের ও অমুহাজেরদের মাঝে মীরাসী স্বত্ব রহিতকরণের হুকুমটি প্রকৃতপক্ষে পৃথক কোন হুকুম নয়, বরং এটিও সে প্রাথমিক নির্দেশ, যা মুসলমান ও অমুসলমানের মাঝে উত্তরাধিকার স্বত্বকে ছিন্ন করে দেয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এই কুফরীর লক্ষণের প্রেক্ষিতে তাকে কাফের বলে সাব্যস্ত করা হয়নি, যতক্ষণ না তার মধ্যে প্রকৃষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে কুফরীর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

আর হয়তো এ যুক্তিতেই এখানে আরেকটি নির্দেশ অমুহাজের মুসলমানদের কথা উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে যে, যদি তারা মুহাজের মুসলমানদের নিকট কোন রকম সাহায্য-সহায়তা কামনা করে, তবে মুহাজের মুসলমানদের জন্য তাদের সাহায্য করা কর্তব্য; যাতে একথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, অমুহাজের মুসলমানদিগকে সম্পূর্ণভাবে কাফেরদের কাতারে গণ্য করা হয়নি, বরং তাদের এই ইসলামী অধিকার এখনও বলবৎ রয়ে গেছে যে, সাহায্য কামনা করলে তারা সাহায্য পেতে পারে।

আর যেহেতু এ আয়াতের শানে-নুযূল মক্কা থেকে মদীনায় বিশেষ হিজরতের সাথে যুক্ত এবং তারাই অমুহাজের মুসলমান ছিলেন, যারা মক্কায় অবস্থান করেছিলেন এবং কাফেরদের উৎপীড়নের সম্মুখীন হচ্ছিলেন, কাজেই তাঁদের সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি যে একান্তই মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে ছিল, তা বলাইবাহুল্য। আর কোরআন করীম যখন মুহাজের মুসলমানদের প্রতি তাদের (অমুহাজের) মক্কাবাসী মুসলমানদের সাহায্যের নির্দেশ দান করেছে, তাতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে একথাই বোঝা যায় যে, যে কোন অবস্থায়, যে কোন জাতির মোকাবেলায় তাঁদের সাহায্য করা মুসলমানদের উপর অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। এমনকি যে জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করা হবে তাদের সাথে যদি মুসলমানদের কোন যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়েও থাকে তবুও তাই করতে হবে, অথচ ইসলামী নীতিতে ন্যায়নীতি ও চুক্তির অনুবর্তিতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। সে কারণেই এ আয়াতে একটি ব্যতিক্রমী নির্দেশেরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অমুহাজের মুসলমান যদি মুহাজের মুসলমানের নিকট এমন কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে, যাদের সাথে মুসলমানরা যুদ্ধ নয় চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছে, তবে চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের মোকাবেলায় নিজেদের মুসলমান ভাইদের সাহায্য করাও জায়েয নয়।

এই ছিল প্রথম দু'টি আয়াতের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। এবার বাক্যের সাথে তুলনা করে দেখা যাক। এরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا

অর্থাৎ,— যে সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নিজেদের প্রিয় জন্মভূমি ও আত্মীয়-আপনজনদের পরিত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্‌র রাহে নিজেদের জান-মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, সম্পদ ব্যয় করে যুদ্ধের জন্য ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছে এবং যুদ্ধের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে; অর্থাৎ, প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজেরবৃন্দ এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে; অর্থাৎ, মদীনার আনসার মুসলমানগণ—এতদুভয়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পরস্পরের ওলী বা সহায়ক। অতঃপর বলা হয়েছে, সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে বটে কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই যতক্ষণ না তারা হিজরত করবে।

এখানে কোরআন করীম ولی ও ولایت শব্দ ব্যবহার করেছে, যার প্রকৃত অর্থ হল বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্ক। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত হাসান কাতাদাহ্ ও মুজাহেদ (রাহঃ) প্রমুখ তফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের মতে এখানে ولایت অর্থ উত্তাধিকার এবং অর্থ ولی উত্তরাধিকারী। আর কেউ কেউ এখানে এর আভিধানিক অর্থ বন্ধুত্ব ও সাহায্য সহায়তাও নিয়েছেন।

প্রথম তফসীর অনুসারে আয়াতের মর্ম এই যে, মুসলমান মুহাজের ও আনসার পারস্পরিকভাবে একে অপরের ওয়ারিস হবেন। তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক না থাকবে অমুসলমানদের সাথে আর নাইবা থাকবে সে সমস্ত মুসলমানের সাথে যারা হিজরত করেননি। প্রথম নির্দেশ অর্থাৎ দ্বীনী পার্থক্য তথা ধর্মীয় বৈপরিত্যের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারের ছিন্নতার বিষয়টি তো চিরস্থায়ী আছেই, বাকী থাকল দ্বিতীয় হুকুমটি। মক্কা বিজয়ের পর যখন হিজরতেরই প্রয়োজন থাকেনি। তখন মুহাজের ও অমুহাজেদের উত্তরাধিকারের বিচ্ছিন্নতার হুকুমটিও আর বলবৎ থাকেনি। এর দ্বারা কোন কোন ফেকাহ্‌বিদ প্রমাণ করেছেন যে, দ্বীনের পার্থক্য যেমন উত্তরাধিকার ছিন্ন হওয়ার কারণ তেমনিভাবে দেশের পার্থক্যও উত্তরাধিকার ছিন্ন হওয়ার কারণ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা ফেকাহ্‌র কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

অতঃপর এরশাদ হয়েছে—

وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থাৎ, এসব লোক হিজরত করেনি যদিও তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু যে কোন অবস্থায় তারাও মুসলমান। যদি তারা নিজেদের দ্বীনের হেফাযতের জন্য মুসলমানদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, তবে তাঁদের সাহায্য করা তাঁদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাই বলে ন্যায় ও ইনসাফের অনুবর্তিতার নীতিকে বিসর্জন দেয়া যাবে না। তারা যদি এমন কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, যাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ নয় চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে, তবে সেক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে সেসব মুসলমানের সাহায্য করা জায়েয নয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে এমনি ঘটনা ঘটেছিল। রসূল করীম (সাঃ) যখন মক্কার কাফেরদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন এবং চুক্তির শর্তে এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, এখন মক্কা থেকে যে ব্যক্তি মদীনায় চলে

যাবে হুযুর (সাঃ) তাকে ফিরিয়ে দেবেন। ঠিক এই সন্ধি চুক্তিকালেই আবু-জান্দাল (রাঃ) যাকে কাফেররা মক্কায় বন্দী করে রেখেছিল এবং নানাভাবে নির্যাতন করছিল কোন রকমে মহানবীর খেদমতে গিয়ে হাজির হলেন এবং নিজের উৎপীড়নের কাহিনী প্রকাশ করে রসূলুল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। যে নবী সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হয়ে আগমন করেছিলেন, একজন নিপীড়িত মুসলমানের ফরিয়াদ শুনে তিনি কি পরিমাণ মর্মাহত হয়েছিলেন, তার অনুমান করাও যার তার জন্য সম্ভব নয়, কিন্তু এহেন মর্মপীড়া সত্ত্বেও উল্লেখিত আয়াতে হুকুম অনুসারে তিনি তাঁর সাহায্যের ব্যাপারে অপারকতা জানিয়ে ফিরিয়ে দেন।

তাঁর এভাবে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি সমস্ত মুসলমানের জন্যই একান্ত পীড়াদায়ক ছিল, কিন্তু সরওয়ারে কায়েনাত (সাঃ) খোদায়ী নির্দেশের আলোকে যেন প্রত্যক্ষ করছিলেন যে, এখন আর এ নির্যাতন-নিপীড়নের আয়ু বেশী দিন নেই। তাছাড়া আর ক'টি দিন ধৈর্যধারণের সওয়াবও আবু-জান্দানের প্রাপ্য রয়েছে। এর পরেই মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এসব কাহিনীর সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। যাহোক, তখন মহানবী (সাঃ) কোরআনী নির্দেশ মোতাবেক চুক্তির অনুবর্তিতাকেই তাঁর ব্যক্তিগত বিপদাপদের উপর গুরুত্বদান করেছিলেন। এটাই হল ইসলামী শরীয়তের সেই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, যার ফলে তাঁরা পার্থিব জীবনে বিজয় ও সম্মান এবং আখেরাতের কল্যাণ ও মুক্তির অধিকারী হতে পেরেছেন। অন্যথায় সাধারণভাবে দেখা যায়, পৃথিবীর সরকারসমূহ চুক্তির নামে এক ধরনের প্রহসনের অবতারণা করে থাকে, যাতে দুর্বলকে দাবিয়ে রাখা এবং সবলকে ফাঁকি দেয়াই থাকে উদ্দেশ্য। যখন নিজেদের সামান্যতম স্বার্থ দেখতে পায়, তখনই নানা রকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করে দেয়া হয় এবং দোষ অন্যের উপর চাপানোর- ফন্দি-ফিকির করতে থাকে।

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে— وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ অর্থাৎ, কাফেররা পরস্পর একে অপরের বন্ধু। وَلِيٌّ শব্দটি যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, একটি সাধারণ ও ব্যাপকার্থক শব্দ। এতে যেমন ওরাসত বা উত্তরাধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত, তেমনিভাবে অন্তর্ভূক্ত বৈষয়িক সম্পর্ক ও পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়ও। কাজেই এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফেরদিগকে পারস্পরিক উত্তরাধিকারী মনে করতে হবে এবং উত্তরাধিকার বন্টনের যে আইন তাদের নিজেদের ধর্মে প্রচলিত রয়েছে, তাদের উত্তরাধিকারের বেলায় সে আইনই প্রয়োগ করা হবে। তদুপরি তাদের এতীম-অনাথ শিশুদের ওলী এবং বিবাহ-শাদীর অভিভাবক তাদেরই মধ্য থেকে নির্ধারিত হবে। সারকথা, সামাজিক বিষয়াদিতে অমুসলমানদের নিজস্ব আইন-কানুন ইসলামী রাষ্ট্রেও সংরক্ষিত রাখা হবে।

আয়াতের শেষভাবে এরশাদ হয়েছে إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ অর্থাৎ, তোমরা যদি এমনটি না কর, তাহলে গোটা পৃথিবীতে ফেৎনা-ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে।

এ বাক্যটি সে সমস্ত হুকুম-আহকামের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, মুহাজেরীন ও আনসারগণকে একে অপরের অভিভাবক হতে হবে—যাতে পারস্পরিক সাহায্য-সহায়তা এবং ওরাসাত তথা উত্তরাধিকারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ এখানকার মুহাজেরীন ও অমুহাজেরীন মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক উত্তরাধিকারের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু সাহায্য-সহায়তার সম্পর্ক তার শর্ত মোতাবেক বলবৎ থাকা উচিত। তৃতীয়তঃ কাফেরগণ একে অন্যের ওলী বিধায় পারস্পরিক অভিভাবকত্ব ও তাদের উত্তরাধিকার আইনের ব্যাপারে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা মুসলমানদের জন্য সমীচীন নয়। বস্তুতঃ এ সমস্ত নির্দেশের উপর যদি আমল করা না হয়, তাহলে পৃথিবীতে গোলযোগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে। সম্ভবতঃ এ ধরনের সতর্কতা এ কারণে উচ্চারিত হয়েছে যে, এখানে যেসব হুকুম-আহ্‌কাম বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো ন্যায়, সুবিচার ও সাধারণ শান্তি-শৃংখলার মূলনীতি স্বরূপ। কারণ, এসব আয়াতের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে গেছে যে, পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্পর্ক যেমন আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল, তেমনিভাবে এক্ষেত্রে ধর্মীয় ও মতাদর্শগত সম্পর্কও বংশগত সম্পর্কের চেয়ে অগ্রবর্তী। সেজন্যই বংশগত সম্পর্কের দিক দিয়ে পিতা-পুত্র কিংবা ভাই-ভাই হওয়া সত্ত্বেও কোন কাফের কোন মুসলমানের এবং কোন মুসলমান কোন কাফেরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এরই সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মূর্খতা জনোচিত বিদ্বেষের প্রতিরোধকল্পে এই হেদায়েতও দেয়া হয়েছে যে, ধর্মীয় সম্পর্ক এহেন সুদৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও চুক্তির অনুবর্তিতা তার চেয়েও বেশী অগ্রাধিকারযোগ্য। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনাবশে সম্পাদিত চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা জায়েয নয়। এমনিভাবে এই হেদায়েতও দেয়া হয়েছে যে, কাফের একে অপরের উত্তরাধিকারী ও অভিভাবক। তাদের ব্যক্তিগত অধিকার ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যেন কোন রকম হস্তক্ষেপ করা না হয়। দৃশ্যতঃ এগুলোকে কতিপয় আনুষঙ্গিক ও শাখাগত বিধান বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বশান্তির জন্য এগুলোই ন্যায় ও সুবিচারের সর্বোত্তম ও ব্যাপক মূলনীতি। আর সে কারণেই এখানে এসব আহ্‌কাম তথা বিধি-বিধান বর্ণনার পর এমন কাঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, যা সাধারণতঃ অন্যান্য আহ্‌কামের ক্ষেত্রে করা হয়নি। তা হল এই যে, তোমারা যদি এসব আহ্‌কামের উপর আমল না কর, তবে বিশ্বময় বিশৃংখলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে। বাক্যটিতে এ ইঙ্গিতও বিদ্যমান যে, দাঙ্গা-বিশৃংখলা রোধে এসব বিধি-বিধানের বিশেষ প্রভাব ও অবদান রয়েছে।

তৃতীয় আয়াতে মক্কা থেকে হিজরতকারী সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের সাহায্যকারী মদীনাবাসী আনসারদের প্রশংসা, তাঁদের সত্যিকার মুসলমান হওয়ার সাক্ষ্য ও তাঁদের মাগফেরাত ও সম্মানজনক উপার্জন দানের ওয়াদার কথা বলা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا অর্থাৎ, তারাই হচ্ছেন সত্যিকারভাবে মুসলমান। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যারা হিজরত করতে পারেননি যদিও তাঁরা মুসলমান, কিন্তু তাদের ইসলাম পরিপূর্ণ নয় এবং নিশ্চিতও নয়। কারণ, তাতে এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, হয়তোবা তারা প্রকৃতপক্ষে মুনাফেক হয়ে প্রকাশ্যে ইসলামের দাবী করছে। তারপরেই বলা হয়েছে لَهُم مَّغْفِرَةٌ অর্থাৎ, তাঁদের জন্য মাগফেরাত নির্ধারিত। যেমন, বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, الاسلام يهدم ماكان قبله والهجرة تهدم ماكان قبلها অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণ যেমন তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়, তেমনিভাবে হিজরত তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়।

চতুর্থ আয়াতে মুহাজেরীনদের বিভিন্ন শ্রেণীর নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যদিও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন প্রাথমিক

পর্যায়ের মুহাজের, যারা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির পূর্বে হিজরত করেছেন এবং কেউ কেউ রয়েছেন দ্বিতীয় পর্যায়ের মুহাজের, যাঁরা হুদায়বিয়ার চুক্তির পরে হিজরত করেছেন। এর ফলে তাঁদের পরকালীন মর্যাদায় পার্থক্য হলেও পার্থিব বিধান মতে তাঁদের অবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজেরীনদেরই অনুরূপ। তাঁরা সবাই পরস্পরের ওয়ারেস তথা উত্তরাধিকারী হবেন। সুতরাং মুহাজেরীনগণকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে – فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ অর্থাৎ, দ্বিতীয় পর্যায়ের এই মুহাজেরীনরাও তোমাদেরই সমপর্যায়ভুক্ত। সে কারণেই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিতেও তাদের হুকুম সাধারণ মুহাজেরদেরই মত।

এটি সূরা আনফালের সর্বশেষ আয়াত। এর শেষাংশে উত্তরাধিকার আইনের একটি ব্যাপক মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এরই মাধ্যমে সেই সাময়িক বিধানটি বাতিল করে দেয়া হয়েছে, যেটি হিজরতের প্রথম পর্বের মুহাজের ও আনসারদের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃ বন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে একে অপরের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। বলা হয়েছে—

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

আরবী অভিধানে اولوا শব্দটি "সাথী" অর্থে ব্যবহৃত হয়। যার বাংলা অর্থ হল 'সম্পন্ন'। যেমন اولوا العقل বুদ্ধিসম্পন্ন। اولوا الامر দায়িত্ব–সম্পন্ন। কাজেই وَأُولُوا الْأَرْحَامِ অর্থ হয় গর্ভ–সাথী, একই গর্ভসম্পন্ন ارحامكم শব্দটি رحم শব্দের বহুবচন। এর প্রকৃত অর্থ হল সে অঙ্গ যাতে সন্তানের জন্মক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আর যেহেতু আত্মীয়তার সম্পর্ক গর্ভের অংশীদায়িত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, কাজেই وَأُولُوا الْأَرْحَامِ আত্মীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বস্তুতঃ আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদিও পারস্পরিকভাবে একে অপরের উপর প্রত্যেক মুসলমানই একটি সাধারণ অধিকার সংরক্ষণ করে এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একের প্রতি অন্যের সাহায্য করা ওয়াজেব হয়ে দাঁড়ায় এবং একে অন্যের উত্তরাধিকারীও হয় কিন্তু যেসব মুসলমানের মাঝে পারস্পরিক আত্মীয়তা ও নৈকট্যের সম্পর্ক বিদ্যমান, তারা অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অগ্রবর্তী। এখানে فِي كِتَابِ اللَّهِ অর্থ فى حكم الله অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা এক বিশেষ নির্দেশ বলে এ বিধান জারি করেছেন।

এ আয়াত এই মূলনীতি বাতলে দিয়েছে যে, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি আত্মীয়তার মান অনুসারে বন্টন করা কর্তব্য। আর وَأُولُوا الْأَرْحَامِ সাধারণভাবে সমস্ত আত্মীয়–স্বজন অর্থেই বলা হয়। তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়ের অংশ স্বয়ং কোরআন করীম সূরা নিসায় নির্ধারিত করে দিয়েছে। মীরাস শাস্ত্রের পরিভাষায় এদেরকে বলা হয় 'আহলে ফারায়েয' বা 'যাবিল ফুরূয'। এদেরকে দেয়ার পর যে সম্পদ উদ্বৃত্ত হবে তা আয়াত দৃষ্টে অন্যান্য আত্মীয়–স্বজনের মধ্যে বন্টন করা কর্তব্য। তাছাড়া এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট যে, সমস্ত আত্মীয়ের মধ্যে কোন সম্পত্তি বন্টন করে দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। কারণ, দূরবর্তী আত্মীয়তা যে সমগ্র বিশ্বমানুষের মাঝেই বর্তমান, তাতে কোন রকম সন্দেহ–সংশয়েরই অবকাশ নেই। সারা পৃথিবীর মানুষ একই পিতা–মাতা, আদম ও হাওয়ার বংশধর। কাজেই নিকটবর্তী আত্মীয়দিগকে দূরবর্তীর উপর অগ্রাধিকার দেয়া এবং নিকটবর্তীর বর্তমানে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করাই আত্মীয়দের মধ্যে মীরাস বন্টনের কার্যকর ও বাস্তবরূপ হতে পারে। এর বিস্তারিত বিবরণ রসূলে করীম (সাঃ)– এর হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'যাবিল ফুরূযে'র অংশ দিয়ে দেয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তা মৃত ব্যক্তির 'আসাবাগণ' অর্থাৎ, পিতামহ সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে পর্যায়ক্রমিকভাবে দেয়া হবে। অর্থাৎ, নিকটবর্তী আসাবাকে দূরবর্তী আসাবা অপেক্ষা অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিকটবর্তী আসাবার বর্তমানে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করা হবে। আর 'আসাবা' এর মধ্যে আর কেউ জীবিত না থাকলে অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করা হবে।

আসাবা ছাড়াও অন্যান্য যেসব লোক আত্মীয় হতে পারে, ফরায়েয শাস্ত্রের পরিভাষায় তাদের বোঝাবার জন্য 'যাবিল আরহাম' শব্দ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই পরিভাষাটি পরবর্তীকালে নির্ধারিত হয়েছে। কোরআনে করীমে বর্ণিত وَأُولُوا الْأَرْحَامِ শব্দটি কিন্তু আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী সমস্ত আত্মীয়–স্বজনের ক্ষেত্রেই ব্যাপক। এতে যাবিল ফুরূয, আসাবা এবং যাবিল আরহাম সবাই মোটামুটিভাবে অন্তর্ভুক্ত।

তদুপরি এর কিছু বিস্তারিত বিশ্লেষণ সূরা নিসার বিভিন্ন আয়াতে দেয়া হয়েছে। তাতে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়ের প্রাপ্য অংশ আল্লাহ্ তাআলা নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাদেরকে মীরাস শাস্ত্রের পরিভাষায় 'যাবিল ফুরূয' বলা হয়। এছাড়া অন্যান্যদের সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন—

الحقوا الفرائض باهلها فما بقى فهو لاولى رجل ذكر–

অর্থাৎ, যাদের অংশ স্বয়ং কোরআন নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাদের দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা তাদেরকেই দিতে হবে যারা মৃতের ঘনিষ্টতম পুরুষ।

এদেরকে মীরাসের পরিভাষায় 'আছাবা' (عصبا) বলা হয়। যদি কোন মৃত ব্যক্তির আসাবাদের কেউ বর্তমান না থাকে, রসূলে করীম (সাঃ)–এর কথা অনুযায়ী তবেই মৃতের সম্পত্তির অংশ তাদেরকে দিতে হবে। এদেরকে বলা হয় 'যাবিল আরহাম।' যেমন, মামা, খালা প্রভৃতি।

সূরা আনফালের শেষ আয়াতের সর্বশেষ বাক্যটির দ্বারা ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের সে ধারাটি বাতিল করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার ভিত্তিতে মুহাজেরীন ও আনসারগণ আত্মীয়তার কোন বন্ধন না থাকলেও পরস্পরের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ হুকুমটি ছিল একটি সাময়িক হুকুম যা হিজরতের প্রাথমিক পর্যায়ে দেয়া ছিল।

সূরা আল-আনফাল সমাপ্ত